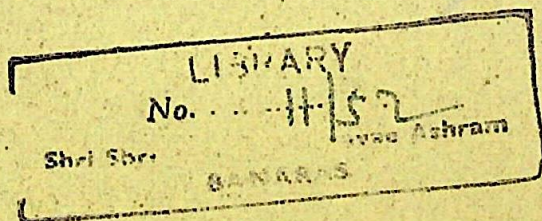


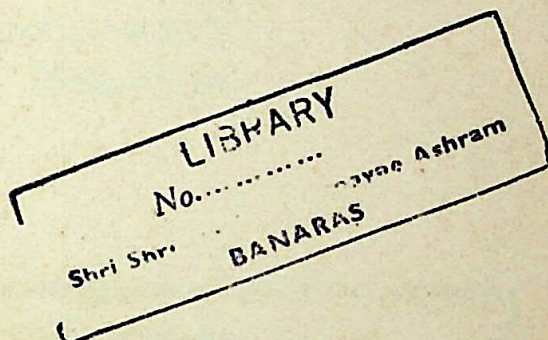
XIV 68 5-11-38
১১/৫২
৩/৩৩০
শব্দার্থতত্ত্ব

[অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য]



শ্রীরবীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তশাস্ত্রী
পঞ্চতীর্থ, এম-এ

শকার্থ তত্ত্ব



শ্রীরবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, এম. এ.
পি-আর-এস, পঞ্চতীর্থ, সপ্তশাস্ত্রী, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের
প্রধান অধ্যাপক, মহারাজ ; বীরবিক্রম কলেজ ; আগরতলা (ত্রিপুরা)

প্রবর্তক পার্বলীশাস
৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন '৬৪
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : পাঁচ টাকা

প্রবর্তক পাবলিশার্স ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১ রমেশ
মিত্র রোড, দি নিউ প্রেস হইতে শ্রীকানাই ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত

11/52

পরমারাধ্যা ওমাতৃদেবীর
শ্রীশ্রীচরণকমলে—

Presented by

M. M. Dr. GOPINATH KAVIRAJ, M. A., D. Litt.

Padma Vibhusan,

in the Sacred memory of his mother,

SUKHADA SUNDARI DEVI.

LIBRARY

No. 52/52

Shri Shri Anandamayee Ashram

BANARAS

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই :

জাতিভেদ ১৮

বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য ১৮

নিত্যপূজা কল্পক্রম ১৮

Essentials of Sanskrit Grammar (প্রকাশিতব্য)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

11/52

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

(১০)

মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কদর্শনভীর্থ মহাশয় ধৈর্য্য-সহকারে সমগ্র পাণ্ডুলিপির পাঠ শুনিয়াছেন। ৩কালীধাম-নিবাসী আনুষ্ঠানিক-খ্যাতি-সম্পন্ন মনীষী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্-এ, ডি-লিট মহোদয় প্রায় সমগ্র গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি দুইখানি দুর্লভ গ্রন্থ কয়েকদিনের জন্ত ধার দিয়া আমার অশেষ উপকার করিয়াছেন। উল্লিখিত পূজনীয় গুরুদেবগণের নিকট হইতে আমি কোন কোন বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়াও উপকৃত হইয়াছি। তাঁহাদের এই উপকার স্মরণ করিয়া আজ আমি পরমভক্তি সহকারে কৃতাজ্ঞলিপিতে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের প্রণয়নে কতদূর কৃতকায্য হইয়াছি, মহাদয় পাঠক মহোদয়গণই তাহা বিচার করিবেন। সতর্কতা সত্ত্বেও বহিখানিতে কয়েকটি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্ত সদাশয় পাঠক মহোদয়গণের নিকটে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। শিবমস্ত।

কলিকাতা, বিজয়াদশমী

১৩৬২ বাংলা

বিনীত

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। শব্দার্থতত্ত্ব শব্দের দুইপ্রকার ব্যুৎপত্তি ...	১
২। 'শব্দের অর্থ = শব্দার্থ' এই অর্থের গ্রহণ ...	"
৩। 'শব্দ ও অর্থ = শব্দার্থ' এই অর্থের গ্রহণ না করার কৈফিয়ৎ,,	"
৪। শব্দব্রহ্মবাদ ...	"
৫। শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে মন্তভেদ ...	২
৬। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ে মীমাংসকদের মত ...	"
৭। ,, কালিদাসের মত ...	৩
৮। ,, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের মত ...	"
৯। ,, বৈয়াকরণদের মত ...	"
১০। বৃত্তির লক্ষণ ...	৪
১১। ,, প্রকারভেদ ...	"
১২। একবৃত্তিবাদিগণের মত ...	৫
১৩। অভিধা ও লক্ষণার পৃথক স্বীকৃতি ...	৭
১৪। অভিহিতাশ্রয়বাদ ও অস্থিতাভিধানবাদ ...	৮
১৫। অভিহিতাশ্রয়বাদের লক্ষণ ...	"
১৬। ,, সমর্থকগণ ...	"
১৭। প্রাচীন-নৈয়ায়িকগণ অভিহিতাশ্রয়বাদী কি না—এই সম্বন্ধে আলোচনা ...	"

(৭০)

বিষয়	পৃষ্ঠা
(ক) প্রাচীন-নৈয়ায়িকগণ অভিহিতাশয়বাদী—এই মত	৮
(খ) উক্ত মতের বিপক্ষে দ্রুস্ত ভট্টের উক্তি ...	৯
(গ) মধুসূদন সরস্বতীর যুক্তি	”
১৮। নব্য বা প্রাচীন কোন নৈয়ায়িকই অভিহিতাশয়বাদী নহেন—এই মতের স্থাপন	১০
১৯। নৈয়ায়িকগণ অম্বিতাভিধানবাদীও নহেন—এই সম্বন্ধে যুক্তি	১২
২০। বৈশেষিকগণের মত	”
২১। অভিহিতাশয়বাদিগণ তাৎপর্যবৃদ্ধি স্বীকার করেন কি না, এই সম্বন্ধে আলোচনা	”
২২। তাৎপর্যের স্বরূপ এবং এই সম্বন্ধে মতভেদ ...	”
২৩। অভিহিতাশয়বাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ...	১৪
২৪। পদের উচ্চারণ ব্যতিরেকেও পদার্থজ্ঞান হয়— এই সম্বন্ধে মীমাংসকদের যুক্তি	১৫
২৫। উক্ত বিষয়ে নৈয়ায়িকদের মত	১৬
২৬। অম্বিতাভিধানবাদের লক্ষণ	১৭
২৭। সমর্থকগণ	”
২৮। পদ প্রমাণ কি না—এই সম্বন্ধে অভিহিতাশয়বাদী ও অম্বিতাভিধানবাদিগণের মতভেদ	১৮
২৯। বৃত্তিহয়বাদিগণের মত	”
(ক) নৈয়ায়িক-মত	”
(খ) বৈশেষিক-মত	২০
(গ) বৈয়াকরণ-মত	২১

(১০)

বিষয়	পৃষ্ঠা
(ধ) বৈদাস্তিক-মত	২১
৩০। বৃত্তিভ্রমবাদিগণের মত	"
(ক) মীমাংসক-মত	"
(খ) সাংখ্য ও যোগদর্শনের মত	২৩
(গ) বেদান্ত-মত	২৪
(ঘ) বৈয়াকরণদের মত	২৬
(ঙ) আলঙ্কারিকদের মত	"
৩১। বৃত্তিচতুষ্টয়বাদী আলঙ্কারিকদের মত	২৭
৩২। বৃত্তি সম্বন্ধে ইউরোপীয় চিন্তাধারা	"

অভিধা

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। পদসমূহের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত	৩০
২। প্রকারান্তরে পদসমূহের শ্রেণীবিভাগ	৩১
(ক) বিভাগদ্বয়বাদী পাণিনির মত	"
(খ) বিভাগ চতুষ্টয়বাদী যাস্কের মত	"
(গ) পতঞ্জলি ও হর্গাচার্যের মত	"
(ঘ) বিভাগ-পঞ্চকবাদী মহিম ভট্টের ,, ...	৩২
(ঙ) আলঙ্কারিকদের মত	"
৩। অভিধার লক্ষণ	৩৩
৪। শক্তি, সম্বন্ধ ও অভিধা একাধর্বোধক	"

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫। বাচকপদগুলির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত	৩৩
(ক) ভর্তৃহরির মত	৩৪
(খ) বিভাগদ্বয়বাদী মীমাংসকদের মত	৩৫
(গ) বিভাগত্রয়বাদী নৈয়ায়িকদের	৩৬
(ঘ) ,, অঙ্গর-দীক্ষিতের ,, ...	৩৭
(ঙ) ,, নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি বৈয়াকরণদের মত	৩৮
(চ) শ্রীপতি দত্ত প্রভৃতি বৈয়াকরণদের মতে যোগরূঢ় পদের অস্বীকৃতি	৩৯
(ছ) যোগরূঢ় পদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে প্রভাকরপন্থীদের যুক্তি	৪০
(জ) বিভাগ চতুষ্টয়বাদী বিশ্বনাথ পঞ্চাননের মত	৪১
৬। যৌগিকপদের লক্ষণ ও উদাহরণ	৪২
৭। রূঢ় ,, ,, ,, ...	৪৩
৮। যোগরূঢ় ,, ,, ,, ...	৪৪
৯। যৌগিকরূঢ় ,, ,, ,, ...	৪৫
১০। যোগরূঢ় ও যৌগিকরূঢ় পদের পার্থক্য	৪৬
১১। রূঢ় পদের শ্রেণীবিভাগ	৪৭
(ক) নৈমিত্তিক পদের লক্ষণ	৪৮
(খ) পারিভাষিক ,, ,, ...	৪৯
(গ) ঔপাধিক ,, ,, ...	৫০
(ঘ) মতান্তরে পারিভাষিক ও ঔপাধিক পদের লক্ষণ এবং প্রকারভেদ	৫১
১২। যোগরূঢ় পদের শ্রেণী বিভাগ	৫২

(১/০)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩। বৌদ্ধিক পদের শ্রেণী বিভাগ ...	৪২
১৪। ঈশ্বরেচ্ছারূপ সংকেত সম্বন্ধে আলোচনা ...	৪৩
১৫। সংকেতগ্রহণের উপায়সমূহ ...	"
(ক) বৃদ্ধব্যবহার ...	"
(খ) অল্পপদের সান্নিধ্য ...	৪৪
(গ) আপ্তোপদেশ ...	"
(ঘ) সংকেতগ্রহণের অত্যাশ্রয় উপায় ...	৪৫
১৬। বৃদ্ধব্যবহারের বিপক্ষে আচার্য্যগণের যুক্তি ...	৪৬
(ক) জয়ন্ত ভট্টের যুক্তি ...	"
(খ) রামানুজাচার্য্যের মত ...	"
(গ) অগ্নয়-দৌগিতের মত ...	"
১৭। জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি আচার্য্যগণ কর্তৃক বৃদ্ধব্যবহারের সমর্থন ...	"
১৮। ঈশ্বরেচ্ছাই সংকেত কি না এই সম্বন্ধে মতভেদ ...	৪৭
১৯। উক্ত মতভেদ সম্বন্ধে আলোচনা ...	"
২০। উদাহরণদ্বারা সংকেত-গ্রহণের ত্রিবিধ উপায় সমর্থন ...	৫০
২১। শক্তিগ্রহ-সম্বন্ধে শাস্ত্রিকগণের মত ...	"
(ক) ব্যাকরণ ...	"
(খ) উপমান ...	৫১
(গ) কোষ ...	"
(ঘ) বাক্যশেষ ...	"
(ঙ) বিবরণ ...	৫২
২২। বৃদ্ধব্যবহার প্রভৃতি তিনটি উপায়ের মধ্যে ব্যাকরণাদি	

(১০)

বিষয়		পৃষ্ঠা
উপায়ের প্রবেশ	...	৫৩
২৩। নানার্থশব্দের অর্থনির্ণয়ের উপায়	...	"
(ক) অর্থ	...	৫৫
(খ) প্রকরণ	...	"
(গ) লিঙ্গ	...	"
(ঘ) ঔচিত্য	...	৫৬
(ঙ) দেশ	...	"
(চ) কাল	...	৫৭
২৪। সংস্কৃত-গ্রন্থের ক্ষেত্রসমূহ	...	"
(ক) জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকদের মত	...	"
(খ) ব্যক্তিশক্তিবাদ প্রভৃতি অন্যান্য মত	...	"
(গ) পাণিনিয় মহাভাষ্যের মত	...	৫৮
(ঘ) ভাস্কর্যের মত	...	"
(ঙ) মহিমভট্টের মত	...	৫৯
(চ) মন্মট ভট্টের "	...	"
(ছ) বিশ্বনাথের "	...	"
(জ) জয়দেবের "	...	৬০
(ঝ) জাতি	...	"
(ঞ) গুণ	...	"
(ট) ক্রিয়া	...	"
(ঠ) দ্রব্য	...	৬১
(ড) সংজ্ঞা, দ্রব্য ও বস্তুচ্ছাশব্দ সম্বন্ধে আলোচনা	...	"
(ঢ) বস্তুযোগ	...	৬৩

(১৮০)

বিষয়	পৃষ্ঠা
(৭) নির্দেশ	৬৩
২৫। ভিত্তি ও ভিত্তি শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা ...	৬৪
২৬। দণ্ডী ও কংস ,, ,, ,, ...	"
২৭। উপাধি	৬৫
২৮। উপাধির বিভাগ	"
২৯। উপাধিসম্বন্ধে মীমাংসকদের মত ...	৬৭
৩০। মীমাংসক-মতের খণ্ডন	৬৯
৩১। অপোহবাদ সম্বন্ধে আলোচনা	৭০
৩২। সংযোগ, বিয়োগ প্রভৃতি কেবলমাত্র ব্যঞ্জনারূপিতই সহায়ক নহে, এই মতের স্থাপন ...	৭৪
৩৩। সংযোগাদি সম্বন্ধে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের মত ...	৭৫
৩৪। সংযোগ প্রভৃতি চতুর্দশটির নামোল্লেখ ...	৭৭
৩৫। সংযোগ প্রভৃতির যোগে অভিধার উদাহরণ ...	"
৩৬। সামর্থ্য ও ঔচিত্যের পার্থক্য	৮০
৩৭। 'কাব্যোৎসবের উপযোগিতা আছে' এই মতের স্থাপন	৮৩

লক্ষণ।

১। লক্ষণের লক্ষণ ও উদাহরণ	৮৭
২। রূঢ়ি ও প্রয়োজন	৮৮
৩। ভক্তি	৮৯
৪। উপচার	৯০

(॥०)

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫। কাব্যপ্রকাশের মতে লক্ষণার বিভাগ ...	৯১
৬। বাহ্যিক শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ ...	৯৫
৭। জয়দেবের মতে লক্ষণার বিভাগ ...	৯৭
৮। সাহিত্যদর্পণের ” ” ” ...	১০১
৯। অঙ্গয়দীক্ষিতের ” ” ” ...	১০৬
১০। ত্রায়মতে ” ” ...	১০৮
১১। বেদান্ত-মতে ” ” ...	১০৬
১২। মন্বন্ত ভট্টের মতের সমালোচনা ...	১০৮
১৩। জয়দেবের ” ” ...	১১৬
১৪। সাহিত্যদর্পণের ” ” ...	১১৯
১৫। অঙ্গয়দীক্ষিতের ” ” ...	১২৬
১৬। ত্রায় মতের সমালোচনা ...	১২৮
১৭। বেদান্ত ” ” ...	১২৯
১৮। নিষ্কম্মমতে চারিপ্রকার লক্ষণা প্রদর্শন ...	১৩০
১৯। লক্ষণা সম্বন্ধে অগ্রাগ্র আলোচনা ...	১৩১
২০। মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের মতের পার্থক্য ...	১৪০
২১। আলঙ্কারিক ও বৈয়াকরণদের মত ...	১৪১

ব্যঞ্জনা

১। ব্যঞ্জনার লক্ষণ ...	১৪২
২। আনন্দবর্কনের মত ...	১৪৪

(॥.)

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩। অভিনব গুপ্ত ...	১৪৫
৪। মন্মট ও বিশ্বনাথ ...	"
৫। নাগেশ ভট্টের মত ...	১৪৬
৬। ব্যঙ্গনার বিপক্ষে যুক্তি ...	১৪৮
৭। বিরুদ্ধমত-খণ্ডন ...	১৪৯
৮। অভিধা ও ব্যঙ্গনার পার্থক্য ...	১৫২
৯। লক্ষণা ও " " ...	১৫৫
১০। নৈয়ায়িক-মত ...	১৫৮
১১। নৈয়ায়িক-মতের খণ্ডন ...	"
১২। অভিনব গুপ্তের মত ...	১৬৪
১৩। বিভাবাদির স্মৃতিই রস নহে ...	১৬৬
১৪। ব্যঙ্গনার প্রকার-ভেদ ...	"
১৫। শাস্ত্রী ব্যঙ্গনা ...	১৬৭
১৬। অভিধামূল্য ব্যঙ্গনা ...	১৬৮
১৭। লক্ষণামূল্য " ...	১৭৪
১৮। আর্থী ব্যঙ্গনা ...	১৭৮
১৯। পরমতে ব্যঙ্গনার ভেদসমষ্টি ...	১৮৬
২০। নিজস্ব মত ...	১৮৭

তাৎপর্য

১। তাৎপর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ...	১৮৮
২। তাৎপর্য শব্দের ব্যুৎপত্তি ...	১৮৯

(৯০)

বিষয়		পৃষ্ঠা
৩। বৃত্তিরূপে তাৎপর্যের স্বীকৃতি ...	...	১২০
৪। অভিহিতাশ্রয়বাদ ও অধিতাভিধানবাদ	...	"
৫। অভিধীয়মানাশ্রয়বাদ		১২১
৬। অধীয়মানাভিধানবাদ		"
৭। জয়ন্ত ভট্টের মত		১২২
৮। অভিহিতাশ্রয়বাদীদের যুক্তি		"
৯। অধিতাভিধানবাদীদের " "		১২৩
১০। এক পদের দুই কার্য		১২৪
১১। মন্যটভট্ট-প্রদর্শিত অনুপপত্তিদ্বয়	...	১২৬
১২। মন্যট ভট্টের যুক্তি খণ্ডন		১২৮
১৩। জয়ন্ত ভট্টের সিদ্ধান্ত		১২৯
১৪। নব্য-নৈয়ায়িকদের মত		২০১
১৫। তাৎপর্য্য বৃত্তি নহে—এই মতের স্থাপন		২০৩

শব্দার্থতত্ত্ব

[অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য]

উপক্রমণিকা

শব্দার্থতত্ত্ব—এই যৌগিক শব্দটির দুই প্রকারের ব্যুৎপত্তি আছে। (১) শব্দ ও অর্থ=শব্দার্থ; (২) শব্দের অর্থ=শব্দার্থ। শব্দার্থের তত্ত্ব=শব্দার্থতত্ত্ব। এই গ্রন্থে দ্বিতীয় অর্থে শব্দার্থশব্দটিকে গ্রহণ করিয়া তাহারই আলোচনা করিব।

শব্দার্থতত্ত্ব শব্দের শব্দতত্ত্বসংক্রান্ত বিষয় কেবলমাত্র যাহা দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গতঃ উপস্থিত হইবে, তাহার আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত রহিব।

প্রথম অর্থে শব্দার্থতত্ত্ব শব্দটিকে গ্রহণ করিলে প্রথমেই শব্দের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার আবশ্যক হয়; কিন্তু এই আলোচনা এত ব্যাপক ও বহুমুখী যে, কেবলমাত্র এই সম্বন্ধেই একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ লেখা চলে।

আচার্য্য ভট্টহরি বলিয়াছেন—

“অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।

শব্দব্রহ্মবাদ

বিবর্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।

(বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড, প্রথম শ্লোক)

এই শব্দব্রহ্মবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রাচীনগণ যুক্তির পর

যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। দার্শনিকগণের মধ্যে কাহারও মতে শব্দ নিত্য; কাহারও বা মতে অনিত্য। এতৎ-
 শব্দের নিত্যতা ও সংক্রান্ত আলোচনা পুস্তকান্তরে করিবার
 অনিত্যতা ইচ্ছা থাকায় এই গ্রন্থে তাহা হইতে বিরত
 রহিলাম।

শব্দের অর্থনির্ণয়-ব্যাপার সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে যেরূপ
 গভীর গবেষণা হইয়াছিল, আমাদের জানা মতে অন্য কোন
 ভাষায় এত গভীর গবেষণা হয় নাই। ভারতীয় আচার্য্যগণের
 সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা এই বিষয়ে চারিটি প্রবল প্রবাহের
 সৃষ্টি করিয়াছে।

শব্দশ্রবণে অর্থবোধ হয়—ইহা সর্বজনবিদিত। শব্দ ও
 অর্থের মধ্যে যে একটি নিত্যসম্বন্ধ বিद्यমান, অতি প্রাচীন-
 কালে মহর্ষি জৈমিনি “ঔৎপত্তিকস্ত শব্দশ্রুতেন লক্ষণঃ”
 (মীমাংসাসূত্র ১।১।৫) এই সূত্রে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ শব্দ ও
 অর্থের নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

মীমাংসক মত সূত্রস্থিত ঔৎপত্তিক শব্দের অর্থ যে নিত্য
 শবরস্বামী তাঁহার ভাষ্যে স্পষ্টই এই কথাটি বলিয়াছেন (ক)।

(ক) ঔৎপত্তিক ইতি নিত্যং ক্রমঃ। উৎপত্তির্হি ভাব উচ্যতে
 লক্ষণয়া। অবিযুক্তঃ শব্দার্থয়োর্ভাবঃ সম্বন্ধো নোৎপন্নয়োঃ পশ্চাৎ সম্বন্ধঃ।

(শাবরভাষ্য ১।১।৫)।

উপক্রমণিকা

৩

মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রথম
 স্কন্ধে “বাগর্থাবিব সম্পূর্ণ্তো” কথাটি লিখিয়া জানাইয়াছেন
 যে, তিনিও শব্দার্থের নিত্য-সম্বন্ধই স্বীকার
 কালিদাসের মত করিতে ন।

নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক
 নৈয়ায়িক ও (নিত্য) সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই বটে,
 বৈশেষিকদের মত কিন্তু তাঁহারাও ইহাদের সাময়িক সম্বন্ধ
 স্বীকার করিয়াছেন। সময় = ‘এই শব্দ এই অর্থ বুঝাইবে’—
 এইরূপ ঐশ্বরেচ্ছা (খ)।

পতঞ্জলি, ভর্তুহরি প্রভৃতি বैयाकरणগণের মতে শব্দ ও
 অর্থের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বিদ্যমান (গ)। মহামতি নাগেশ
 তাঁহার ‘লঘুমঞ্জুবা’ নামক গ্রন্থে মহাভাষ্যের
 বैयाकरणদের মত তাদাত্ম্যসম্বন্ধমূচক উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া
 ইহাকেই সমর্থন করিয়াছেন। নাগেশভট্ট এই তাদাত্ম্যের

(খ) ন, সাময়িকত্বাচ্ছদার্থসম্প্রত্যয়শ্চ। (গৌতমসূত্র ২। ১। ৫৫)।

সাময়িকঃ শব্দাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ। (কণাদসূত্র ৭। ২। ২০)।

সময় ঐশ্বর-সঙ্কেতঃ, অস্মাচ্ছদাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইত্যাকারঃ।

(প্রশস্তপাদ-ভাষ্য ৭। ২। ২০)

(গ) সঙ্কেতস্ত পদ-পদার্থয়োরিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকো
 যোহয়ং শব্দঃ নোহর্থঃ, যোহর্থঃ স শব্দ ইতি। (পাতঞ্জল মহাভাষ্য)

তাদাত্ম্যানুগম্যৈব শব্দার্থশ্চ প্রকাশকাঃ। (বাক্যপদীয়)

একটি স্বতন্ত্র লক্ষণও করিয়াছেন (ঘ) ।

নিত্যই হউক, সাময়িকই হউক, বা তাদাত্ম্যরূপই হউক শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ আছে, ইহা সর্ববাদি-সম্মত । কেহ ইহাকে বাচ্য-বাচকরূপে, কেহ বোধ্যবোধকরূপে কেহ বা অন্তরূপে কল্পনা করিয়াছেন । গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধির আশঙ্কায় এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম ।

শব্দ শ্রবণে যে অর্থবোধ হয়, তাহার (সেই অর্থবোধের) প্রতি শব্দই কারণ । কারণ থাকিলে তাহার একটি ব্যাপার বা কার্য থাকিবেই । এক্ষেত্রেও শব্দের অর্থবোধের অনুকূল

একটি ব্যাপার আছে । শব্দের এই ব্যাপার-
বুত্তির লক্ষণ

কেই ভারতীয় আচার্য্যগণ বুত্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন । যখন একটি অর্থের সহায়তায় আর একটি অর্থের প্রতীতি হয়, তখন এই বুত্তি অর্থগতও হইতে পারে বলিয়া কোন কোন আচার্য্য মনে করেন ।

অনেকের মতে বুত্তি চারিটি । ইহাদের নাম—অভিধা
লক্ষণা, ব্যঞ্জনা এবং তাৎপর্য্য । প্রাচীন
বুত্তির প্রকারভেদ
আচার্য্যগণের সকলে আবার ইহাদের
সকলটি স্বীকার করেন নাই ।

কেহ কেহ বলেন, একমাত্র অভিধাবুত্তির সাহায্যেই সকল অর্থ নির্ণীত হইতে পারে ; কাজেই, এই বিষয়ে লক্ষণা

উপক্রমণিকা

৫

প্রভৃতি পৃথক বৃত্তি স্বীকারের কোন প্রয়ো-
 একবৃত্তিবাদিগণের মত জন নাই। ইহারা লক্ষণাকেও অভিধার
 অংশরূপে বিবেচনা করেন। আচার্য্য মুকুল ভট্ট এই দলের
 লোক।

উল্লিখিত আচার্য্য তাঁহার রচিত ‘অভিধাবৃত্তিমাতৃকা’
 নামক গ্রন্থে লক্ষণাকেও অভিধাবৃত্তির অন্তর্গত বলিয়া গণনা
 করিয়াছেন। তিনি বলেন—মুখ্য এবং লাক্ষণিক ভেদে
 অভিধা দুই প্রকার; তন্মধ্যে মুখ্য জাতি, গুণ ক্রিয়া ও
 জবাভেদে চারিপ্রকার এবং লাক্ষণিক উপাদানাদিভেদে ছয়
 প্রকার। সুতরাং তাঁহার মতে অভিধা-বৃত্তির মোট বিভাগ
 দশটি (ঙ)।

সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরীয় পণ্ডিত মহিম ভট্টের মতেও শব্দের
 ব্যাপার মাত্র একটি; অর্থাৎ, তিনি একমাত্র অভিধাকেই
 বৃত্তিরূপে স্বীকার করিয়াছেন। অভিধা-ব্যতিরিক্ত স্থলে যে
 অর্থবোধ হয়, মহিম ভট্টের মতে তাহা অনুমিতির সাহায্যে
 হইয়া থাকে। অতএব স্বীকৃত লক্ষণা প্রভৃতি মহিম-ভট্টের
 মতে অনুমিতির অন্তর্গত। এই অনুমিতিকে যে তিনি
 ব্যাপার মনে করেন না, তাহাও আচার্য্য মহিম-ভট্ট তাঁহার

(ঘ) তত্ত্বিন্নসে সতি তদভেদেন প্রতীয়মানত্বম্ [তাদান্ব্যম্]।

(লঘুমঞ্জুবা)

(ঙ) ইত্যেতদভিধাবৃত্তং দশধাত্ব বিবেচিতম্। (অভিধাবৃত্তিমাতৃকা)

‘ব্যক্তিবিবেক’ নামক গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন (চ)।

মনীষী শ্রীযুক্ত কান্তি চন্দ্র পাণ্ডে এম-এ, পি-এইচ্-ডি, ডি-লিট্ মহোদয় তাঁহার “Indian Aesthetics” নামক গ্রন্থে মহিম ভট্টের এই মতটিও আলোচনা করিয়াছেন (ছ)। লক্ষণা সম্বন্ধে ব্যক্তিবিবেকের মত আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পাণ্ডে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিবেককার লক্ষণাকে

(চ) বাচকত্বাশ্রয়েণৈব গুণবৃত্তিরসঙ্গতা।

... ..

ব্যঙ্গকত্বৈকমূলত্বমসিদ্ধঞ্চ ধ্বন্যর্থতঃ।

... ..

‘বিষং ভক্ষয় মা চাস্ত গৃহে ভুক্তা’ ইত্যাদাবপি যদেতদ্ বিষ-ভক্ষণানুজ্ঞানং তদর্থপ্রকরণাদিসহায়মেতদগৃহে ভোজনস্ত ততোহপি দারুণতরপরিণামত্বমনুমাণম্ভিতি।

বিষভক্ষণানুজ্ঞানাদেবাক্যার্থস্তাপ্রস্তুতশ্চৈবোপপত্তাসৌ হি পূর্বো-ক্তেন নয়েন প্রস্তুতাতিরিক্তার্থান্তরপ্রতিপাদনপরত্বাৎ তত্র হেতুতয়াব-গম্যব্য ইতি ন শব্দস্ত তত্র ব্যাপারঃ পরিকল্পনীয়ঃ। (ব্যক্তিবিবেক)

(ছ) Mahima Bhatta holds that words have only one power, that of arousing the conventional meaning ; accordingly they have only one function. Other functions, such as that of arousing the suggested, or more correctly, the inferred meaning belong to the meaning only and not to the word (Indian Aesthetics, Page—302)

উপক্রমণিকা

৭

অনুমিতির অন্তর্গত মনে করেন, সুতরাং ব্যক্তিবিবেকের মতে লক্ষণার পৃথক্ অস্তিত্ব নাট (জ)।

মুকুল ভট্ট ও মহিম ভট্টের মতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুকুল ভট্ট লক্ষণার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ইহাকে অভিধার মধ্যেই নিবিষ্ট করিয়াছেন ; আর মহিম-ভট্ট লক্ষণার অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই।

বৈয়াকরণ-কেশরী আচার্য্য নাগেশ-ভট্টের নামে প্রচলিত 'পরমলঘুমঞ্জু' নামক গ্রন্থে পৃথগ্ভাবে লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনাতেও স্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই গ্রন্থেও অভিধা এবং লক্ষণাকে একই শক্তির প্রকারভেদরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে (ঝ)।

অভিধা ও লক্ষণার
পৃথক্ স্বীকৃতি

অন্যান্য আচার্য্যগণ অভিধা হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্ভাবে লক্ষণাবৃত্তিকে ও গণনা করিয়াছেন। যত বিরোধ—ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য্যকে

(জ) Mahima Bhatta includes the secondary meaning (Gauna or Laksanika Artha) in the inferable (Anumeya). Accordingly, he denies the second power of words, technically called Laksana. (Indian Aesthetics)

(ঝ) তথাহি শক্তির্বিবিধা—প্রসিদ্ধা অপ্রসিদ্ধা চ। আমন্দবুদ্ধি-বেত্তাঃ প্রসিদ্ধাস্থম্। সঙ্কদয়-স্কদয়মাত্রবেত্তাস্থমপ্রসিদ্ধাস্থম্। তত্র গদ্যাদিপদানাং প্রবাহাদৌ প্রসিদ্ধা শক্তিঃ, তীরাদৌ চাপ্রসিদ্ধেতি।
(পরমলঘুমঞ্জু)

লইয়া। তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে দুইটি
 অভিহিতাশ্রয়বাদ পরস্পরবিরোধী মত দেখা যায়, তাহাদের
 ও অস্থিতাভিধানবাদ নাম—(১) অভিহিতাশ্রয়বাদ, এবং (২)
 অস্থিতাভিধানবাদ।

প্রথমোক্ত মতে, বাক্যস্থিত প্রত্যেকটি পদ উচ্চারিত
 হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজ নিজ অর্থ বুঝায়; তাহার পর
 অন্যান্য পদের উচ্চারণ ও অর্থ-প্রতিপাদনের পর সমুদয়
 পদের অর্থসমূহ পরস্পর অস্থিত হইয়া সমগ্র বাক্যের অর্থ
 বুঝাইয়া থাকে।

এই মতে, অভিহিত বা পদোপস্থাপিত
 অভিহিতাশ্রয়বাদ অর্থ সমূহের পরস্পর অস্থয়ের ফলে বাক্যার্থ
 প্রতিপাদিত হয় বলিয়া স্বীকার করায় ইহাকে
 ‘অভিহিতাশ্রয়বাদ’ বলা হইয়া থাকে (ঞ)।

আচার্য্য কুমারিল-ভট্ট এবং তাহার অনুগামী মৌমাংসকগণ
 অভিহিতাশ্রয়বাদের সমর্থক। তাহা ছাড়া প্রাচীন নৈয়ায়িক
 এবং বৈশেষিকগণও অভিহিতাশ্রয়বাদীরূপে পরিচিত।
 পণ্ডিত প্রবর ৩রামচরণ তর্কবাগীশ সাহিত্যদর্পণ-
 বিবৃতিতে ‘অভিহিতাশ্রয়বাদিনাম্’ পদের ব্যাখ্যায়

(ঞ) অভিহিতানাং স্বস্ববৃত্ত্যা পদৈরুপস্থাপিতানাং মর্থানাং স্বয়ং ইতি
 যে বদন্তি তেহভিহিতাশ্রয়বাদিনঃ। [মঃ মঃ দুর্গাপ্রসাদ রচিত
 সাহিত্যদর্পণটিপ্পনী, (ছায়া)]

উপক্রমণিকা

১২

প্রাচীননৈয়ায়িকদের মত সম্বন্ধে আলোচনা প্রাচীন-নৈয়ায়িকদিগকে স্পষ্টই অভিহিতা-
 য়বাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (ট)।

জয়ন্ত-ভট্টের উক্তি কাশ্মীর-দেশীয় মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত
 ভট্টের 'আয়মঞ্জরী' নামক গ্রন্থ হইতে জানা
 যায় যে, বহু পূর্ব হইতে "নৈয়ায়িকগণ অভিহিতায্যবাদী
 বা অস্থিতাভিধানবাদী—ইহাদের কোনটিই নহেন" এইরূপ
 একটি মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। উল্লিখিত আচার্য্য
 একটি প্রাচীন কারিকাদ্বারা উক্ত মতটি প্রদর্শন করিয়াছেন (ঠ)।

মধুসূদন সরস্বতীর উক্তি আচার্য্য মধুসূদন-সরস্বতীর মতেও
 প্রাচীন-নৈয়ায়িকগণ অভিহিতায্যবাদী বা
 অস্থিতাভিধানবাদী, ইহাদের কোনটিই নহেন ; তাঁহাদের মত
 উক্ত উভয় মত হইতে ভিন্নপ্রকারের। উল্লিখিত আচার্য্য
 তাঁহার 'বেদান্তকল্পলতিকা' নামক গ্রন্থে তর্কিকদের মত
 হিসাবে প্রাচীন-নৈয়ায়িকদের মত উল্লেখ করিয়া মীমাংসকদের
 মত হইতে তাহার পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর
 তিনি দেখাইয়াছেন যে, অভিহিতায্যবাদী ও অস্থিতাভি

(ট) অভিহিতানামভিধয়া লক্ষণয়া বা পদোপস্থাপিতানামম্বয়-
 বোধবাদিনাং প্রাচীননৈয়ায়িকানামিত্যর্থঃ। (সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয়
 পরিচ্ছেদ ব্যাখ্যা)

(ঠ) তত্বত্বে—“মতম্বয়মপীদন্ত নাম্নভ্যং যোচতেতরাম্।

কুতোহস্থিতাভিধানং বা কুতো রাভিহিতায্যঃ॥”

[আয়মঞ্জরী (চৌখায়া), প্রমাণ-প্রকরণ, পৃষ্ঠা—৩৭০]

১০

শব্দার্থতত্ত্ব

ধানবাদী উভয়েই মীমাংসক, এবং ইহাদের উভয়েই শব্দের অর্থপ্রতীতিজননসামর্থ্যরূপ সম্বন্ধকে মুখ্য্য বৃত্তিরূপে স্বীকার করিয়াছেন; অপরপক্ষে প্রাচীন-নৈয়ায়িকদের মতে ঈশ্বরেচ্ছারূপ সংকেতই মুখ্য্যবৃত্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে (ড)। আচার্য্য মধুসূদন-সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-নামক গ্রন্থেও তাঁহার 'বেদান্তকল্পলতিকা'র এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন (ঢ)।

নৈয়ায়িকেরা
অভিহিতাশ্রয়বাদী
নহেন

বস্তুতঃ, নব্য বা প্রাচীন কোন নৈয়ায়িকই অভিহিতাশ্রয়বাদী নহেন। অভিহিতাশ্রয়-বাদিগণের মতে পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞানের করণ; কিন্তু নৈয়ায়িকদের মত এইরূপ নহে। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞায়মান পদই বাক্যার্থজ্ঞানের করণ; আর নব্য নৈয়ায়িকদের মতে বাক্যার্থ-জ্ঞানের করণ—পদজ্ঞান (ণ)।

(ড) তথাহি পদবৃত্তিস্তাবদ্ ধেধা—মুখ্য্য জঘন্তা চ।

তত্র মুখ্য্য সামান্ত্যবিশিষ্টব্যক্তিবিশয়ান্বাচ্ছবাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতী-
শ্বরেচ্ছারূপসংকেত ইতি তার্কিকাঃ।

সামান্ত্যমাত্রবিষয়ঃ স্বাভাবিক এবার্থপ্রতীতিজননসামর্থ্যালক্ষণঃ সম্বন্ধ
ইতি মীমাংসকাঃ। (বেদান্তকল্পলতিকা)

(ঢ) তার্কিকমতশ্রোভয়পক্ষবহির্ভাবাদিকন্তু বেদান্তকল্পলতিকায়াং
ব্যুৎপাদিতমিত্যুপরম্যতে। [অদ্বৈতসিদ্ধি, (নির্ণয়সাগর), পৃষ্ঠা—৭০৫]

(ণ) পদজ্ঞানন্ত করণং, দ্বারন্তত্র পদার্থধীঃ। (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

মহামহোপাধ্যায় ৩কণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'ন্যায়দর্শন' নামক গ্রন্থে বাৎস্তায়ন-ভাষ্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নব্য ও প্রাচীন নৈয়ায়িকদের এই মতভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (ত)।

নব্য-নৈয়ায়িকগণ যে অভিহিতাশয়বাদী নহেন, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, তাঁহারা তাৎপর্য্যকে বৃত্তিরূপে স্বীকার করেন না। নব্যন্যায়ের গ্রন্থসমূহে তাৎপর্য্যকে আসত্তি প্রভৃতির ন্যায় বাক্যার্থ-নির্ণয়ের সহায়করূপেই

পদজ্ঞানং করণম্, পদার্থোপস্থিতির্ব্যাপারঃ, আকাজ্জা-যোগতাসত্তি-
তাৎপর্য্যজ্ঞানানি সহকারীণি, কলং শাস্ত্রবোধঃ। (তর্কামৃতম্)

(ত) প্রাচীনগণ চরম কারণ ব্যাপারকেই মুখ্য কারণ বলিলেও ঐ ব্যাপারদ্বারা বাহ্য কার্য্যজনক, তাহাকেও কারণ বলিতেন, এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে। প্রকৃতস্থলে অনেক প্রাচীনগণই জায়মান শব্দকে পূর্ব্বোক্ত পদার্থস্বরূপ ব্যাপারজনক কারণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ শব্দজ্ঞানকে কারণ না বলিয়া জায়মান শব্দকে কারণ বলিয়াছেন। সুতরাং এই মতে শব্দজ্ঞান শব্দ-প্রমাণ হইবে না, জায়মান শব্দ শব্দ-প্রমাণ হইবে। নব্যনৈয়ায়িকগণ এই মতের অনেক প্রতিবাদ করিলেও মহর্ষি কিন্তু শব্দজ্ঞানকে শব্দপ্রমাণ বলেন নাই। তিনি আগুবাধ্যকে শব্দপ্রমাণ বলায় বুঝা যায়, জায়মান শব্দকেই শব্দপ্রমাণ বলিয়াছেন, এবং ঐ প্রমাণ শব্দকে দৃষ্টার্থক বলাতে উহা যে শব্দই, শব্দজ্ঞান নহে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। (ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫০)

বিবেচনা করা হইয়াছে ; বৃত্তিরূপে নহে (খ) ।

নৈয়ায়িকেরা
অস্থিতাভিধানবাদীও বলা চলে না ; কারণ, অস্থিতাভিধানবাদি-
নহেন গণের মতে পদার্থই বাক্যার্থ ।

বৈশেষিক মত
বৈশেষিকগণের মতও বৃত্তিবিষয়ে নৈয়ায়িক-
দের মতেরই অনুরূপ । কাজেই, বৈশেষিক-
দিগকেও অভিহিতাশয়বাদী বা অস্থিতাভিধানবাদী—
ইহাদের কোনটিই বলা চলে না ।

সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে অভিহিতাশয়-
অভিহিতাশয়বাদ ও
তাৎপর্য-বৃত্তি
বাদিগণকে স্পষ্টভাবেই তাৎপর্য-বৃত্তির
স্বীকর্তারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ) ।
আচার্য্য কুমারিল-ভট্টই অভিহিতাশয়বাদের প্রতিষ্ঠাতারূপে
পরিচিত ; কিন্তু তিনি তাৎপর্য নামে কোন বৃত্তির উল্লেখ
করেন নাই ।

তাৎপর্য
তাৎপর্য কি, এবং তৎসম্বন্ধে চিন্তানায়ক-
গণের মধ্যে কে কি বলিয়াছেন, সম্প্রতি

(খ) আসত্তিযোগ্যতাকাজ্জাতাত্পর্য্যজ্ঞানমিশ্রিতে ।

(ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা—৮২)

আসত্তিজ্ঞানং যোগ্যতাজ্ঞানমাকাজ্জ্ঞানস্তাত্পর্য্যজ্ঞানঞ্চ শাকবোধে
কারণম্ । (সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী) ।

(দ) অভিহিতাশয়বাদিভিরঙ্গীকৃত্য তাৎপর্যাখ্যা বৃত্তিরপি সংসর্গ-
মাত্রো পরিক্ষীণা ন ব্যঙ্গ্যবোধিনী । (সাহিত্যদর্পণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

পদ অভিধা বা লক্ষণাদ্বারা স্বীয় অর্থ প্রতিপাদন করে। এই অর্থসমূহ প্রতিপাদিত হইলে পর তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বোধিত হয়। এই সম্বন্ধবোধনের অনুকূল ব্যাপার কি, এবং এই ব্যাপার পদগত, না অর্থগত, না বাক্যগত— এই বিষয়ে দার্শনিকগণের মতভেদ স্পষ্ট। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে পদগত অম্বয়বোধজনিকা একটি স্বরূপসত্তী (অজ্ঞাত) শক্তি আছে; এই শক্তির নাম তাৎপর্য্য। অভিধারূপ সঙ্কেত এবং লক্ষণারূপ শব্দ্যসম্বন্ধ যেমন জ্ঞাত না হইয়া অর্থবোধ করায় না, তাৎপর্য্যশক্তি তাদৃশ নহে। এই শব্দের এই অম্বয়রূপ অর্থে তাৎপর্য্য আছে—ইহা অম্বয়বোধের পূর্বে জানা যায় না, এবং জানা আবশ্যক ও নহে; কিন্তু ইহা অজ্ঞাত থাকিয়াই অম্বয়রূপ অর্থবোধ করাইয়া থাকে। বহির দাহকর্ত্তে শক্তি অজ্ঞাত থাকিলেও যেমন দাহরূপ কার্য্য করে, ইহাও তেমনি। নব্যনৈয়ায়িকগণের মতে এই শক্তি পদগত আকাজ্ঞাদি সহ অম্বয়বোধরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন করে। ইহাকে সংসর্গমৰ্য্যাদানামে নব্যন্যায়্যে অভিহিত করা হইয়াছে; তাৎপর্য্য বলা হয় নাই।

অভিহিতাম্বয়বাদী মীমাংসকের মতে এই শক্তি লক্ষণাব্যতিরিক্ত কিছু নহে। তাহাদের মতে লক্ষণা অর্থগত। শব্দে ইহা আরোপিত হয়। যাহাতে যাহা অবিদ্যমান থাকিয়াও তদুগত ধর্ম্মরূপে জ্ঞাত হয়, তাহা আরোপিত

(অসতো জ্ঞানমারোপঃ) ।

আলঙ্কারিকগণের মতে সম্বন্ধরূপ বাক্যার্থ পদার্থ নহে, কিন্তু পদার্থভিন্ন । ইহার বোধক শক্তিকে তাঁহার। তাৎপর্য আখ্যা দিয়াছেন । এই তাৎপর্যশক্তির অধিকরণ পদ বা বাক্য—ইহা মনুষ্য ভট্ট স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেন নাই । বিশ্বনাথের মতে, মনে হয়, ইহার আশ্রয় বাক্য ; কিন্তু ঈদৃশ ব্যাখ্যায় ত্রায়মতের ও মীমাংসামতের সহিত সুস্পষ্ট বিরোধ উপস্থিত হয় । যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, সকল মতেই অদ্বয়বোধানুকূল শক্তি অভিধাদি-ব্যতিরিক্ত এবং ইহা স্বরূপসত্তী ।

প্রভাকর যদিও অদ্বয়বোধিনী শক্তিকে অভিধানামে অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি ইহা স্বরূপসত্তী থাকিয়াই অদ্বয়বোধ উৎপাদন করে বলিয়া তিনিও মনে করেন । ইহা শালিকনাথ মিশ্রের ‘প্রকরণ-পঞ্জিকা’ নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় ।

ত্রায়কুসুমাজলির তৃতীয়স্তবকে ১৫শ কারিকার ব্যাখ্যায় উদয়নাচার্য্য এবং প্রকাশ-টীকায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এই সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন ।

বস্তুতঃ, এই অভিহিতাশ্রয়বাদের প্রথম
অভিহিতাশ্রয়বাদের
উৎপত্তি ও জননিকার
সূচনা করিয়াছেন—মহর্ষি জৈমিনি । তিনি
“তদুত্তানাং ক্রিয়ার্থেন সমান্নায়োহর্থস্ত
তন্নিমিত্তত্বাৎ” (জৈমিনিসূত্র ১।১।২৫) এই সূত্রে ‘অর্থস্ত

তন্নিমিস্ত্বাৎ' কথাটি দ্বারা স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, বাক্যার্থপ্রতীতির কারণ অর্থ, অর্থাৎ পদার্থ। মহর্ষি জৈমিনির এই সূত্রটিকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তীকালে অভিহিতাশয়বাদ, অস্থিতাভিধানবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। শবরস্বামী এই সূত্রটিকে তাঁহার ভাষ্যে আর একটু পরিষ্কার করিয়াছেন। ভট্ট কুমারিল শবরস্বামীর ভাষ্যকে অভিহিতাশয়বাদের অনুকূলে, আর প্রভাকর ভট্ট অস্থিতাভিধানবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উল্লিখিত সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী বলিয়াছেন যে, বাক্যের ঘটক পদসমূহ স্ব স্ব বাচ্যার্থের উপস্থাপন করিয়া বিরতব্যাপার হইয়া থাকে। অনন্তর অবগত পদার্থসমূহ যোগ্যতাদিবশে বাক্যার্থের প্রতিপাদন করে (ধ)। এই স্থলে শবরস্বামী স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন যে, বাক্যার্থের প্রতিপাদন পদার্থই করে, কিন্তু পদ করে না। ভট্ট কুমারিল একটি উদাহরণ দ্বারা এই মতটিকে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, দূর হইতে পরিদৃশ্যমান কোন অশ্বের অস্পষ্ট শ্বেতবর্ণ দেখিয়া এবং সেই প্রদেশে হ্রেষাশব্দ ও ক্ষুর-বিক্ষেপশব্দ শুনিয়া কোন পুরুষের এরূপ প্রতীতি হয় যে, শ্বেতবর্ণ একটি

পদার্থজ্ঞান সম্বন্ধে
নীমাংসক-মত

একটি উদাহরণ দ্বারা এই মতটিকে সমর্থন
করিয়াছেন। তিনি বলেন, দূর হইতে
পরিদৃশ্যমান কোন অশ্বের অস্পষ্ট শ্বেতবর্ণ

(ধ) পদানি হি স্বংস্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারানি, অথেদানীং
পদার্থা অবগতাঃ সন্তঃ বাক্যার্থং গময়ন্তি। (শাবরভাষ্য)।

অশ্ব ধাবিত হইতেছে (ন)। এইস্থলে বাক্যের উচ্চারণ না থাকিলেও পদার্থের অবগতি দ্বারা পদার্থসমূহের সংসর্গরূপ বাক্যার্থ অবগত হওয়া যায়। এই জন্ত বাক্যার্থবোধে পদার্থই করণ ; পদ করণ নহে।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ যদিও জ্ঞায়মান
নৈয়ায়িক মত

পদকেই উচ্চারিত বাক্যের অর্থজ্ঞানের করণ মনে করেন, তথাপি পদ বা বাক্যের উচ্চারণ-ব্যতিরেকেও যে পদার্থ বা বাক্যার্থের প্রতীতি হইতে পারে, এ কথা তাঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন।

মহর্ষি গোতম “ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নির্ঘোষণং জ্ঞানমব্যপদেশ্য-মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্” (ন্যায়সূত্র ১।১।৪) এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই (শব্দোচ্চারণ ব্যতিরেকেও) অর্থজ্ঞান জন্মে। মহর্ষি বাৎস্তায়ন উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় এই কথাটিকে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, শব্দোচ্চারণ ব্যতিরেকেও কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নির্ঘোষণাহেতুই অর্থজ্ঞান জন্মিতে পারে। ইহার অনুকূল যুক্তিও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন (প)।

(ন) পশুতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেশশব্দং চ শৃণ্বতঃ।

স্মরবিক্ষেপশব্দঞ্চ শ্বেতাশ্বো ধাবতীতি ধীঃ ॥

(প) তদেবমর্থজ্ঞানকালে স ন সমাখ্যাশব্দো ব্যাপ্তিয়তে, ব্যবহার-

অস্থিতাভিধানবাদ
 অস্থিতাভিধানবাদ
 উচ্চারণমাত্রই অর্থবোধ হয় না ; কিন্তু যে কোন পদ শ্রবণ-মাত্রই ইতরাশ্রিত-স্বার্থের অনুভাবক হইয়া থাকে (পদমবিতার্থানুভাবকম্)। কোন পদই অনস্থিত পদার্থের বোধ জন্মাইতে পারে না। 'পচতি' প্রভৃতি একটি পদ যখন বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তখনও উক্ত পদ কর্তা, কৰ্ম্ম প্রভৃতির সহিত অস্থিত হইয়াই অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া অস্থিতাভিধানবাদিগণ মনে করেন। এই মতে পদ অস্থিতার্থের অনুভাবক হয় বলিয়া স্বীকার করায় ইহাকে অস্থিতাভিধানবাদ বলা হইয়া থাকে। আচার্য্য প্রভাকর ভট্ট এবং তাঁহার অনুগামী মীমাংসকগণ অস্থিতাভিধানবাদের সমর্থক।

যখন রামঃ, বৃক্ষঃ, নদী প্রভৃতি যে কোন একটিমাত্র পদ উচ্চারিত হয়, তখন সে কেমন করিয়া অস্থিতার্থের বোধ জন্মাইবে—এই সংশয়ের উত্তরে প্রভাকর ভট্ট বলেন যে, ঐরূপ স্থলেও অস্তি, ভবতি প্রভৃতি যে কোন একটি ক্রিয়া-পদার্থের সহিত উক্ত পদের অঙ্গরূপ থাকে (ফ)।

এই প্রসঙ্গে আর একটু কথা বলা আবশ্যক। অভিহিতা-

কালে তু ব্যাপ্রিয়তে। তস্মাদশাস্ত্রমর্থজ্ঞানমিচ্ছিত্যর্থসম্বন্ধিধোঃপন্নমিতি।

(বাংশ্রায়ন ভাষ্য ১। ১। ১৪)

(ফ) পদার্থান্তাবস্থাভিতিরিক্তাঃ কচিৎপলভ্যন্তে, অস্ততোহস্ত্যর্থেন।

[বৃহতী (নির্ণয়সাগর), পৃষ্ঠা—৩৮৫]

স্বয়বাদিগণের মতে পদ পদার্থের অভিধান * (প্রতিপাদন)

পদের প্রাণাণ্য মাত্র করাইয়া ক্ষান্ত হয়; তাহার অনুভব
সম্বন্ধে মতভেদ করাইতে পারে না। এই কারণে পদ

প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না; কেবলমাত্র বাক্যই

প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। অপরপক্ষে অস্বিতাভি-

ধানবাদিগণের মতে পদসমূহই বাক্যরূপে গৃহীত হয়;

এই কারণে, পদ বাক্য হইতে পৃথক্ নহে বলিয়া সেও

প্রমাণ হইতে পারে।

নৈয়ায়িকেরা 'অভিধা ও লক্ষণা' এই দুইটিমাত্র বৃত্তি
স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে, অভিধা ও লক্ষণার সীমার

বাহিরে যে তৃতীয় অর্থ আছে, অনুমিতির
বৃত্তিব্যব ও নৈয়ায়িক
মত সাহায্যেই তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে;

অতএব ব্যঞ্জनावृत्ति স্বীকার করা অনাবশ্যক।

নব্যনৈয়ায়িকগণ যে তাৎপর্যকে বৃত্তিরূপে স্বীকার করেন

* পদ পদার্থের অনুভাবকও নহে, স্মারকও নহে, কিন্তু
অভিধায়ক। কোন পদের উচ্চারণ করিলে যে অর্থজ্ঞান হয়, তাহা
'পদাৎ পদার্থমনুভবামি' বা 'পদাৎ পদার্থং স্মরামি' ইত্যাকার নহে;
কিন্তু 'পদাৎ পদার্থং জ্ঞানামি' এই প্রকার। এই কারণে "অনুভূতিঃ
স্মৃতিশ্চ" এই প্রসিদ্ধ দ্বিবিধ জ্ঞানের অতিরিক্ত একটি তৃতীয়
প্রকারের জ্ঞান পদার্থ-প্রতিপাদনের ব্যাপারে কার্য্য করিয়া থাকে।
অভিহিতাঙ্গবাদিগণের মতে এইরূপ জ্ঞান সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া অবশ্য
স্বীকার্য্য। ১২৭।

না, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থের গ্রন্থসমূহেও তাৎপর্য্যকে বৃত্তিরূপে স্বীকার করার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ ব্যঞ্জनावृत्ति খণ্ডন করিবার জন্য বিবিধ মূল ও টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মূল গ্রন্থের মধ্যে মহিম ভট্টের ব্যক্তিবিবেক এবং টীকাগ্রন্থের মধ্যে ৩মাধব-তর্কসিদ্ধান্ত-প্রণীত শক্তিবাদের টীকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যঞ্জनावृत्তির অসাধারণ বৈচিত্র্য-যে কোন কোন নৈয়ায়িকের অন্তরে রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের লেখা দেখিলেই বুঝা যায়। শক্তিবাদের রচয়িতা গদাধর ভট্টাচার্য্য ব্যঞ্জनावृत्ति স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—শক্তি ও লক্ষণাভেদে বৃত্তি দুই প্রকার (ব)। কিন্তু শক্তিবাদের প্রাচীন টীকাকার ৩মাধব তর্কসিদ্ধান্ত এই স্থলের ব্যাখ্যায় ব্যঞ্জনারও উল্লেখ করিয়া নৈয়ায়িকমূলত যুক্তিদ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই খণ্ডন তাঁহার মনঃপূত হয় নাই; কারণ তিনি পরে বলিয়াছেন—উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সমীচীন এবং কোনটি সমীচীন নহে, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন (ভ)।

(ব) বৃত্তিষ্ট দ্বিবিধা—শক্তিলক্ষণা চ। (শক্তিবাদ)

(ভ) অনয়োঃ সমীচীনত্বাসমীচীনত্বে সুধীভির্নির্ভাব্যে।

৩৭হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত এই স্থলের শক্তিবাদের টীকায় ব্যঞ্জनावृत्तिজন্ত-বোধকে মানস-বোধের অন্তর্গত বলিয়াছেন; কাজেই, তিনিও এক হিসাবে ব্যঞ্জनावृत्तिकে স্বীকার করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে।

কাশ্মীরদেশীয় মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার ‘ন্যায়-মঞ্জরী’র প্রমাণ প্রকরণে (চৌখায়া সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৪৫) ধ্বনি-প্রস্থান স্পর্শ করিয়াও প্রকৃত বিচারের অনুপযোগী মনে করিয়া সম্মানের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ধ্বন্যালোকের রচয়িতা আলঙ্কারিক আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধনকে লক্ষ্য করিয়া জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন—

“যমন্তঃ পণ্ডিতস্মন্তঃ প্রপেদে কঞ্চন ধ্বনিম্।

বিধিনিষেধাবগতির্বিধিবুদ্ধিনিষেধতঃ ॥”

এই স্থলে তিনি আনন্দবর্দ্ধনকে পণ্ডিতস্মন্ত বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আনন্দবর্দ্ধনের প্রতিষ্ঠিত ধ্বনি-প্রস্থান অথবা ব্যঞ্জनावृत्तिकে খণ্ডন করিবার জন্তও বিশেষ চেষ্টা করেন নাই।

বৈশেষিক-দর্শন বস্তুতঃ ন্যায়েরই অঙ্গবিশেষ; কাজেই বৈশেষিকেরাও নৈয়ায়িকদের অনুরূপ মতই বৈশেষিক মত পোষণ করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ বৈয়াকরণগণও অভিধা ও লক্ষণা নামে দুইটি বৃত্তির স্বীকর্তা হিসাবেই পরিচিত। নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি যে সকল বৈয়াকরণ ব্যঞ্জनावृत्तिकেও স্বীকার

করিয়াছেন, তাঁহাদের মত পরে আলোচিত
বৈয়াকরণ মত হইবে। তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বৈয়াকরণদের
মত নব্যনৈয়ায়িকগণের মতেরই অনুরূপ।

বৈদান্তিকগণের মধ্যেও বৃত্তিবিষয়ে দ্বিবিধ মত দেখা
যায়। তন্মধ্যে ‘বেদান্ত-পরিভাষা’ নামক সুপ্রসিদ্ধ
গ্রন্থের রচয়িতা ‘ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র’ প্রভৃতি
বৈদান্তিক মত কোন কোন বৈদান্তিকের মতে অভিধা ও
লক্ষণাভেদে বৃত্তি দ্বিবিধ (ম)। যে সকল বৈদান্তিক গোণী
নামে আর একটি বৃত্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত পরে
আলোচিত হইবে।

মীমাংসকদের মতে বৃত্তি তিনটি ; যথা—
বৃত্তিত্রয় ও অভিধা, লক্ষণা, এবং গোণী (য)।
মীমাংসক-মত আলঙ্কারিকদের মতে এই গোণীবৃত্তি
লক্ষণারই প্রকারভেদ (র)। বেদান্ত-পরিভাষাকারও এই

(ম) পদার্থশ্চ দ্বিবিধঃ—শব্দো লক্ষ্যশ্চেতি। (বেদান্ত-পরিভাষা)

(য) ঋতার্থন্ত পরিভাষ্য লক্ষণার্থো বিধীয়তে।

(মীমাংসা-শ্লোকবাস্তবিক)

তৎসিদ্ধির্জাতি-সাক্ষ্য-প্রশংসা-ভূম-লিঙ্গসমবায় ইতি গুণাশ্রয়াঃ।

(জৈমিনিমুদ্র ১।৪।২৩)।

(র) সাদৃশ্যেতরসম্বন্ধাঃ শুদ্ধান্তাঃ সকলা অপি।

সাদৃশ্যন্তু মতা গোণ্যঃ—॥

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

কথাই বলিয়াছেন (ল)। বৈয়াকরণদের মতেও গোণী লক্ষণারই প্রকারভেদ (ব)।

কুমারিল ভট্ট লক্ষণা হইতে গোণীবৃত্তিকে স্পষ্টভাবে পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

“লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্ বৃত্তেরিষ্টা তু গোণতা।”

ইহার অভিপ্রায়—‘সিংহো মাণবকঃ’ এইরূপ বলিলে সিংহ পদ শক্তিদ্বারা পশুবিশেষকে এবং লক্ষণাদ্বারা সিংহগত প্রায়িক ধর্ম্য ক্রৌর্য্য-শৌর্য্যাদিকে বুঝাইয়া থাকে। তাহার পর গোণী-বৃত্তিদ্বারা সিংহগত-ক্রৌর্য্যশৌর্য্যাদিগুণসদৃশ-ক্রৌর্য্য-শৌর্য্যাদিগুণযুক্ত মাণবককে বুঝায়। এই জন্ত গুণযোগে এই বৃত্তি প্রবৃত্ত হয় বলিয়া ইহার নাম গোণী হইয়াছে। লক্ষণার সীমার বাহিরে বর্তমান গোণার্থ প্রতিপাদনের জন্ত এই বৃত্তি স্বীকার করা আবশ্যক।

মীমাংসকদের এই মতটি বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য। সাদৃশ্যসম্বন্ধে লক্ষণা স্বীকার করিলে গোণীবৃত্তির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করা নিরর্থক হইয়া পড়ে। সাদৃশ্যসম্বন্ধে লক্ষণা স্বীকার্য্য কি না, তাহাই ভাবিবার বিষয়। বস্তুতঃ, পদ এবং পদার্থসমূহের সংসর্গ (অন্বয়)-সম্বন্ধই শাক্তবোধে প্রতিভাসমান হয়; সাদৃশ্যসম্বন্ধ কেবলমাত্র ঔপম্যাদি-প্রতি-

(ল) গোণ্যপি লক্ষিতলক্ষণৈব। (বেদান্তপরিভাষা)

(ব) সা দ্বিবিধা—গোণী শুদ্ধা চ। (লঘুমঞ্জুর্বা)

পাদনে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে। কাজেই, গোণীবৃত্তিসম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের মত অপেক্ষা মীমাংসকদের মতটিকেই আমরা অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করি। তবে, সাদৃশ্যসম্বন্ধদ্বারা যে ঔপম্যাদির প্রতীতি হয়, তাহা আমাদের বিবেচনায় ব্যঞ্জনা-বৃত্তির অন্তর্গত। এইজন্য আমরা মীমাংসকসম্মত এই তৃতীয়া বৃত্তিকে ব্যঞ্জनावৃত্তির অন্তর্গত বলিয়া মনে করি। এই কারণে, বর্তমান গ্রন্থে গোণীবৃত্তি সম্বন্ধে পৃথক কোন আলোচনা করা হইবে না।

মীমাংসকেরা ব্যঞ্জনা বা তাৎপর্য নামে কোন বৃত্তি স্বীকার করেন নাই। মীমাংসকদের মতে অভিধা, লক্ষণা, ও গোণীবৃত্তির সীমার বাহিরে যে অর্থ আছে, অর্থাপত্তির সাহায্যে তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে। এই অর্থাপত্তিকে কেহই বৃত্তি নামে অভিহিত করেন নাই। বস্তুতঃ, ইহা আয়শাস্ত্রসম্মত অনুমানেরই অনুরূপ।

সাংখ্য ও যোগদর্শনে উল্লিখিত বৃত্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনাই দেখা যায় না। কেবলমাত্র ‘সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর’ একখানি টীকায় জ্ঞানৈক সাধু বৃত্তিবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু, বিখ্যাত সাংখ্যাচার্য্যগণের কেহই এই

সম্বন্ধে আলোচনা না করায় বৃত্তিবিষয়ে

সাংখ্য ও যোগ
দর্শনের মত

সাংখ্যের কোন নিজস্ব মত আছে, একথা

জোর করিয়া বলা চলে না। সাংখ্যশাস্ত্রে

ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই; কাজেই, সাংখ্য-মতাবলম্বীরা

ঈশ্বর-সংক্লেত স্বীকার করিতে পারেন না। শব্দার্থবোধের ব্যাপারে তাঁহাদের মত নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকদের মতের তুল্য বলিয়া মোটামুটিভাবে ধরা যাইতে পারে।

যোগদর্শনের 'ভাস্ক্য বাচকঃ প্রণবঃ' এই সূত্রটি হইতে জানা যায় যে, উক্ত দর্শনেও শব্দার্থের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে। লক্ষ্য-লক্ষক বা ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক প্রভৃতি অন্য কোন সম্বন্ধের উল্লেখ যোগদর্শনে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনেরই অঙ্গ বিশেষ। অতএব, বৃত্তিবিষয়ে ইহাদের কোন মত থাকিলে তাহা একই প্রকার হওয়াই স্বাভাবিক।

বৈদান্তিকগণের মধ্যে যে বৃত্তিবিষয়ে দ্বিবিধ মত আছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তন্মধ্যে 'বৈদান্ত্য-পরিভাষা' নামক গ্রন্থের মত পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যান্য বৈদান্তিকেরা বৃত্তিবিষয়ে মীমাংসকদের অনুরূপ মতই পোষণ করেন;

অর্থাৎ তাঁহাদেরও মতে অভিধা, লক্ষণা ও বৈদান্ত্যমত

গৌণীভেদে বৃত্তি তিনটি। ব্রহ্মসূত্রে 'গৌণী' শব্দের এবং তাহার ভাষ্যসমূহে গৌণী ও উপচার শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে 'গৌণ্যসম্ভবাৎ' (২।৫।৩) এই সূত্রটি আছে। সূত্রকার নিজেই আকাশের উৎপত্তি-প্রতিপাদনের ক্ষতি গৌণী বলিয়া পূর্বপক্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ১।১।৬ সূত্রে 'গৌণ্যশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ' এবং ২।৪।২ সূত্রে 'গৌণ্যসম্ভবাৎ' বলিয়া

গৌণীবৃত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই গৌণীবৃত্তি লক্ষণার অন্তর্গত কি না, এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে বা তাহার ভাষ্যসমূহে কিছুই বলা হয় নাই। বস্তুতঃ, অদ্বৈত বেদান্তে 'ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ' এইরূপ স্বীকার করা হয়; অর্থাৎ ব্যবহারভূমিতে অদ্বৈত-বেদান্তিগণও কুমারিল ভট্টের সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। কুমারিল ভট্ট লক্ষণা হইতে পৃথগ্ভাবে গৌণী-বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং উপরোক্ত মতটি স্বীকার করিলে অদ্বৈতবেদান্তিগণকেও স্বতন্ত্র-গৌণীবৃত্তির সমর্থক বলিতে হইবে।

লক্ষণা হইতে এই গৌণীবৃত্তিকে পৃথগ্ভাবে স্বীকার করার পক্ষে নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া পূজ্যপাদ ৩মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় তাহার 'বেদান্ত-কল্পলতিকা' নামক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন (শ)।

বৈদান্তিকগণও ব্যঞ্জনা নামে কোন পৃথক্ বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তাহাদের মত নৈয়ায়িক এবং বৈয়াকরণগণের মতেরই অনুরূপ (ঘ)।

(শ) জঘন্তাপি দ্বিবিধা—লক্ষণা, গৌণী চ। ...

গৌণ্যাস্ত বৃত্তিষ্যদ্ব্যক্‌ষ্মান লক্ষণায়ামন্তর্ভাবঃ। তন্মাল্লক্ষণাদতি-
রিক্তৈব বৃত্তিগৌণীতি চতুরশ্রম্। (বেদান্তকল্পলতিকা)

(ঘ) বাক্যজ্ঞানজ্ঞানে চাকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্ত্বয়ন্তাৎপর্য্যজ্ঞানঞ্চেতি চত্বারি
কারণানি। (বেদান্তপরিভাষা)

বৈদান্তিকগণও অর্থাপত্তি স্বীকার করেন ; কিন্তু তাহাকে বৃত্তিনামে অভিহিত করেন না ।

বৃত্তির শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে যে বৈয়াকরণদের মধ্যে দ্বিবিধ মত আছে, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এই সম্বন্ধে বৃত্তিদ্বয়বাদী বৈয়াকরণগণের মতও বৈয়াকরণ মত

প্রদর্শিত হইয়াছে । নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি কোন কোন বিশিষ্ট বৈয়াকরণ ব্যঞ্জनावৃত্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিয়াছেন (স) । আচার্য্য নাগেশ ভট্টের মতে সকল বৈয়াকরণেরই ব্যঞ্জनावৃত্তি স্বীকার করা উচিত । এই প্রসঙ্গে তিনি স্বকীয় মতের সমর্থনে প্রাচীন বৈয়াকরণগণের মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন (হ) ।

আলঙ্কারিকগণের মধ্যেও বৃত্তির প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায় । আচার্য্য ধনিক তাঁহার ‘কাব্য-নির্ণয়’ নামক গ্রন্থে ব্যঞ্জनावৃত্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন ।

তাঁহার মতে অভিধা ও লক্ষণার সীমার আলঙ্কারিকদের মত বাহিরে যে সকল রসাদি অর্থ আছে, তাৎপর্য্য বৃত্তির সাহায্যেই তাহাদের জ্ঞান হয় । তিনি বলেন,

(স) সা বৃত্তিস্থিধা—শক্তির্লক্ষণা ব্যঞ্জনা চ । (লঘুমঞ্জুবা)

(হ) অতএব নিপাতানাং দ্ব্যতকত্বমাকর উক্তম্ । স্ফোটশ্চ চ ব্যঙ্গ্যতা হর্যাদিভিরুক্তৈব । দ্ব্যতকত্বঞ্চ সমভিব্যাহৃতপদশক্তিব্যঞ্জকত্ব-মেবেতি বৈয়াকরণানামপ্যেতৎস্বীকার আবশ্যকঃ ।

(বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তমঞ্জুবা)

তাৎপর্য্য-বৃত্তির কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই ; প্রয়োজনবোধে তাৎপর্য্যবৃত্তি যে কোন প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে (ক্ষ) ।

আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ তাৎপর্য্য-বৃত্তি স্বীকারের প্রয়োজন বোধ করেন নাই । তাঁহাদের মতে অভিধা ও লক্ষণার অগোচরে বর্তমান সকল অর্থই বাঞ্ছনাবৃত্তির সাহায্যে প্রতীত হয় । মন্মট, বৃত্তিচতুষ্টয়বাদী বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ আবার চারিটি বৃত্তিই স্বীকার করিয়াছেন (অ) ।

এই সকল বৃত্তি যে কেবল সংস্কৃতভাষায়ই স্বীকার করা হইয়াছে, এমন নহে ; ইংরাজীভাষায় যাহারা শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রকারান্তরে ইহাদিগকে স্বীকার করিয়াছেন । Primary sense এবং Secondary sense নামে ইংরাজীতে যে দুইটি সর্বজনবিদিত কথা আছে, তাহারা বস্তুতঃ অভিধা ও লক্ষণার নামান্তর ।

(ক্ষ) যাবৎকার্য্যপ্রসারিত্বাৎ তাৎপর্য্যং ন তুলাধুতম । (কাব্যনির্ণয়)

(অ) অভিধা-তাৎপর্য্য-লক্ষণাত্মক-ব্যাপারত্রয়াতিবর্তী ধ্বননাদি-ব্যাপারোহনপল্লবনীয় এব । (কাব্যপ্রকাশ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

বৃত্তীনাং বিশ্বাস্তোরভিধা-তাৎপর্য্য-লক্ষণাখ্যানাম্ ।

অদ্বীকার্য্য তুর্ঘ্যা বৃত্তিবোধে রসাদীনাম্ ॥

(মাহিত্যদর্পণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, কারিকা—১)

লেডি ওয়েবলি তাঁহার 'Significs and Language' নামক গ্রন্থে শব্দের তিন প্রকার অর্থ স্বীকার করিয়াছেন (আ)। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা নামক বৃত্তিত্রয়ের সঙ্গে ইহা তুলনীয়।

অন্যেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'কাব্যালোক' নামক গ্রন্থে বৃত্তি ও ধ্বনি সম্বন্ধে ইউরোপীয় সমালোচকগণের মতও আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজী-সাহিত্যে চারিপ্রকার বৃত্তির স্বীকর্তা রিচার্ডস্ সাহেবের মতও শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন (ই)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে,

(আ) The one crucial question in all expression is its special property, first of sense, that in which it is used, then of meaning as the intention of the user, and, most far reaching and momentous of all, of implication, of ultimate significance.

[Significs and Language (1911), page—9]

(ই) আই, এ, রিচার্ডস্ তাঁহার Practical Criticism গ্রন্থে (Part III, ch I, Page—181—186 এবং p 355—357) মানুষের উচ্চারিত বাক্যকে চারিটি দিক্ হইতে বিচার করিয়াছেন, সেগুলি হইতেছে,—Sense, Feeling, Tone এবং Intention, অর্থাৎ অর্থ, ভাব, স্বর বা প্রকৃতি এবং অভিপ্রায়।

(কাব্যালোক)

ইংরাজী সাহিত্যেও মতভেদে দুই, তিন, অথবা চারিটি
বৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য সমালোচক-
গণের চিন্তাধারা প্রাচ্য চিন্তাধারা হইতে অনেকটা ভিন্ন
প্রকারের ; এই কারণে তাঁহাদের চিন্তাধারার দ্বিধাত্ব
প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

অভিধা

অর্থবোধের কারণরূপ শব্দ বা পদগুলির প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন আচার্য্যেরা পদগুলিকে এক, দুই, পদের শ্রেণী-বিভাগ তিন, চারি, পাঁচ অথবা ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

যাঁহারা কেবল জাতিতে বা কেবল ব্যক্তিতেই শক্তিগ্রহ হয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে যথাক্রমে জাতি-বাচক বা ব্যক্তিবাচকরূপে পদ একপ্রকার। যাঁহারা জাতি এবং ব্যক্তি উভয়েই শক্তিগ্রহ স্বীকার করেন, কিন্তু অন্যত্র শক্তিগ্রহ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে পদ জাতিবাচক ও ব্যক্তিবাচক ভেদে দুই প্রকার। অন্তেরা ইহাদের সহিত লিঙ্গবাচক পদ যোগ করিয়া তিনপ্রকার, অপরেরা সংখ্যা-বাচকসহ চারিপ্রকার এবং অন্য একদল কারকবাচক যোগে পাঁচ প্রকার পদ স্বীকার করিয়া থাকেন। 'বৈয়াকরণ-ভূষণ-সার' নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে (ক)। এই সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কারিকাও দেখা যায়; যথা—

(ক) একং দ্বিকং ত্রিকং চাথ চতুষ্কং পঞ্চকন্তথা।

নামার্থ ইতি সর্ব্বেষ্মণী পক্ষাঃ শাস্ত্রে ব্যবস্থিতাঃ ॥

(বৈয়াকরণভূষণসার)

“স্বার্থো দ্রব্যঞ্চ লিঙ্গঞ্চ সংখ্যা কৰ্ম্মাদিরেব চ।

অমী পঞ্চৈব নামার্থাস্ত্রয়ঃ কেবাঞ্চিদগ্রিমাঃ ॥

নিরুক্তের ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য ছয় প্রকার পদেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্যান্য আচার্য্যগণ আবার অন্তপ্রকারে পদের প্রকারান্তরে পদের বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। মহামুনি পাণিনি শ্রেণী-বিভাগ সুবন্ত ও তিঙ্‌স্ত ভেদে দুই প্রকার পদের পাণিনি মত উল্লেখ করিয়াছেন (খ)। নিরুক্তকার যাস্কের মতে পদ চারি প্রকার; যথা—নাম, ক্রিয়া, উপসর্গ ও নিপাত (গ)। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও পদের চতুর্বিধত্বই স্বীকার করিয়াছেন।

নিরুক্তের ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য এক, দুই, তিন, পাঁচ এবং ছয় প্রকার পদ বিভাগের উল্লেখক্রমে দুর্গাচার্য্যের মত ইহাদের প্রত্যেকটি অস্বীকার করিয়া পদের

(খ) সুপ্তিঙ্‌স্তং পদম্। (পাণিনিসূত্র ১।৪।১৪)

(গ) চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতান্ত।

(নিরুক্ত, নৈষট্‌কাণ্ড)

(ঘ) নৈকং পদজাতং যথা—অর্থঃ পদমৈম্মাপ্যমিতি। নাপি দ্বৈ, যথা—সুবন্তং তিঙ্‌স্তঞ্চ। নাপি ত্রীণি, নিপাতোপসর্গাবেকতঃ কৃষা। নাপি পঞ্চ ষড়্‌ বা, যথা—গতি-কৰ্ম্মপ্রবচনীয়ভেদেনেতি।

(নিরুক্ত-ব্যাখ্যা, নৈষট্‌কাণ্ড)

চতুর্বিধত্বই সমর্থন করিয়াছেন (ঘ)।

ব্যক্তিবিবেককার মহিম-ভট্টের মতে পদ পাঁচ প্রকার;
যথা— নাম, ক্রিয়া, উপসর্গ, নিপাত এবং
মহিম ভট্টের মত
কর্মপ্রবচনীয় (ঙ)।

মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণের মতে পদগুলি
বাচক, লাক্ষণিক, এবং ব্যঞ্জক ভেদে তিন
আলঙ্কারিকদের মত
শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা যথাক্রমে অভিধা,
লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা নাম্নী বৃত্তি বা ব্যাপারের সাহায্যে অর্থ-
প্রকাশ করিয়া থাকে (চ)।

যদিও এই তিনটি ছাড়া তাৎপর্য নামে আর একটি বৃত্তির
অস্তিত্ব অনেকে স্বীকার করেন, তথাপি উল্লিখিত আচার্য্য-
গণের মতে উক্ত তাৎপর্য পদগত শক্তি নহে। এই সম্বন্ধে কিছু
আলোচনা উপক্রমণিকাতেই করা হইয়াছে; বাকী আলোচনা
পরে করা হইবে।

(ঙ) তত্র পদমনেক-প্রকারঃ নামাখ্যাতোপসর্গনিপাত-কর্ম-
প্রবচনীয়ভেদাৎ। (ব্যক্তিবিবেক, প্রথম বিমর্শ)

(চ) শ্রাদ্ বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোহত্র ব্যঞ্জকজ্ঞিধা।

(কাব্যপ্রকাশ. দ্বিতীয় উল্লাস)

বাচ্যোহর্থোহভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।

ব্যদ্যো ব্যঙ্গনয়া তাঃ স্যান্তিস্রঃ শব্দস্ত শক্তয়ঃ॥

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ, কারিকা—৩)

প্রত্যেক শব্দেরই একটি সর্বজন-প্রসিদ্ধ মুখ্য (প্রথমোপ-
স্থিত) অর্থ আছে। সূর্য্য, চন্দ্র, জল, মনুষ্য প্রভৃতি শব্দ
উচ্চারণমাত্রই সর্বজন-প্রসিদ্ধিবশতঃ নিজ
অভিধার লক্ষণ নিজ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। শব্দ যে ব্যাপারের
সাহায্যে এইরূপ লোকপ্রসিদ্ধ মুখ্য অর্থ বুঝায়, সেই
ব্যাপারই অভিধা নামে পরিচিত। এই
শক্তি ও সঙ্কেত অভিধা শক্তি বা সঙ্কেত নামেও কথিত হয়।

অভিধা = অভি—ধা + অঙ্।

সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর রচয়িতা আচার্য্য বিশ্বনাথ পঞ্চানন
বলেন—“পদের সহিত পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহাই শক্তি।
‘এই শব্দ এই অর্থ বুঝাইবে’—এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাকেই শক্তি
বলে” (ছ)। বিশ্বনাথ পঞ্চানন বলেন—এই শক্তি একমাত্র
পদেই থাকে ; এই কারণে পদকে শক্ত বলা যায়।

বাচক বা শক্ত পদগুলির শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আচার্য্য-
গণের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কোন কোন আচার্য্য
বাচক-পদগুলির মধ্যে কোনরূপ অবাস্তুর
বাচক পদের
শ্রেণী-বিভাগ বিভাগ কল্পনা করেন নাই। কেহ কেহ
ইহাদিগকে দুইটি শ্রেণীতে, কেহ কেহ তিনটি
শ্রেণীতে, এবং কেহ কেহ বা চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত
করিয়াছেন।

(ছ) শক্তিশ্চ পদেন সহ পদার্থস্ত সম্বন্ধঃ। সা চাস্মাচ্ছবাদয়মর্থো
বোধ্যব্য ইতীশ্বরেচ্ছারূপা। (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

আচার্য্য ভর্তৃহরি সঙ্কেতকে আজানিক ও আধুনিক নামে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আজানিক অর্থ জন্মরহিত (উৎপত্তিরহিত), অর্থাৎ মনুষ্য প্রভৃতির রচিত ভর্তৃহরির মত নহে। ঋতিসমূহ অপৌরুষেয় ; সুতরাং ঋতিতে যে সকল সঙ্কেত গৃহীত হইয়াছে, তাহারাও অপৌরুষেয়। এইরূপ অপৌরুষেয় সঙ্কেতই আজানিক বা নিত্যসঙ্কেত নামে অভিহিত হইয়াছে। ঈদৃশ সঙ্কেত অনাদিকাল হইতে প্রবর্তিত আছে, সুতরাং কে কখন ইহার প্রথম প্রয়োগ করিল, কেহই বলিতে পারে না। এই কারণেই ইহারাজানিক। এই আজানিক সঙ্কেত ঈশ্বরেচ্ছা ভিন্ন আর কিছু নহে। আচার্য্য ভর্তৃহরির মতে এই ঈশ্বরেচ্ছা বা নিত্যসঙ্কেতই শক্তিপদবাচ্য। আধুনিক বা মনুষ্য-রচিত সঙ্কেতকে তিনি শক্তি নামে অভিহিত করেন নাই।

আচার্য্য প্রভাকর-ভট্ট ও তাঁহার অনুগামী মীমাংসক-গণের মতে বাচক পদগুলি রূঢ় ও যৌগিকভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উল্লিখিত আচার্য্যগণ লাক্ষণিক মীমাংসক-মত এবং গোণভেদে আরও দুই প্রকার পদ স্বীকার করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহাদের মতে পদগুলি মোট চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁহার ‘শব্দশক্তি-প্রকাশিকা’ নামক গ্রন্থে বাচক পদগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে

নেয়ায়িক মত
 বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—রূঢ়, যোগরূঢ়,
 এবং যৌগিক । ইহা ছাড়া তিনি লক্ষক
 (লাক্ষণিক) নামে আর একটি বিভাগ স্বীকার করিয়া পদ-
 গুলির মোট চারিটি শ্রেণী প্রদর্শন করিয়াছেন । উক্ত
 আচার্য্য একথাও জানাইয়াছেন যে, অন্তদের মতে যৌগিক-
 রূঢ় নামে পদের আর একটি শ্রেণী স্বীকৃত হইয়া থাকে (ঝ) ।
 আচার্য্য অগ্নয়দীক্ষিতও তাঁহার বৃত্তিবাস্তিক-নামক গ্রন্থে
 বাচক শব্দগুলিকে রূঢ়, যৌগিক ও যোগরূঢ়
 অগ্নয়দীক্ষিতের মত, ভেদে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন (ঞ) ।
 নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি কোন কোন বৈয়াকরণের মতেও
 বাচক পদগুলি উল্লিখিত প্রকারে তিনটি
 শ্রেণীতে বিভক্ত । আচার্য্য নাগেশ 'লঘু-
 মঞ্জুবা' নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে তাঁহার মত স্পষ্টভাবেই
 লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (ট) ।

- (জ) আজ্ঞানিক্‌চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধো মতঃ ।
 নিত্য আজ্ঞানিকস্তত্র বা শক্তিরিতি গীয়তে ॥ (বাক্যপদীয়)
- (ঝ) রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব যোগরূঢ়ঞ্চ যৌগিকম্ ।
 তচ্চতুর্দ্ধা, পরৈ রূঢ়যৌগিকং মন্ততেহধিকম্ ॥
 (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, কারিকা--১৬)
- (ঞ) শক্ত্যা প্রতিপাদকত্বমভিধা । স' ত্রিধা—রূঢ়ির্যোগো যোগ-
 টিচ্চ । (বৃত্তিবাস্তিক)
- (ট) শক্তিস্থিধা—রূঢ়ির্যোগো যোগরূঢ়িচ্চ । (লঘুমঞ্জুবা)

শ্রীপতিদত্ত প্রভৃতি কোন কোন বৈয়াকরণ যোগরূঢ় নামে শব্দের পৃথক্ শ্রেণী স্বীকার করেন না। আচার্য্য

জগদীশ তর্কালঙ্কার বৈয়াকরণদের মতরূপে শ্রীপতিদত্তের মত উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া তাঁহার ‘শব্দশক্তি-প্রকাশিকা’-নামক গ্রন্থে উহা খণ্ডন করিয়াছেন (ঠ)।

বস্তুতঃ, ইহা বৈয়াকরণদের একটি দলের মত। মহামহোপাধ্যায় ও গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯১৪ ইংরেজীতে প্রকাশিত শব্দশক্তি

(ঠ) যদিপি পঙ্কজননকর্তৃষু পঙ্কজাদিপদানাং শক্তিসম্বন্ধেইপি পঙ্কজপদান্ন তাদ্রূপোণ পদ্ব্যস্ত বোধঃ, পরন্তু পদ্ব্যস্তমাত্রোণ, যোগার্থমর্থ্যান পঙ্কজাতত্বপ্রকারকবোধসামান্যং প্রত্যেব পদ্ব্যস্তবিশিষ্টে রুঢ়িজন্য লাঘবেন বিরোধিত্বাৎ, পদ্ব্যস্তধর্ম্মিকত্বাদেগৌরবেণ প্রতিবধ্যকোট প্রবিষ্টত্বাদতো যোগরূঢ়ঃ নাইব নাস্তি, যুধিষ্টিরশব্দাদপি রণস্থিরত্বাদিব যোগার্থং পরিত্যজ্যেব বৈজাত্যাদিপ্রকারেণ কুন্তীপুত্রাত্ত্ববগম্য যদুক্তমভিযুক্তৈঃ—

“যা বৃত্তিরজহংস্বার্থা সেয়মত্রোপপাদিতা।

জহংস্বার্থা তু তত্রৈব যত্র রুঢ়ির্বিরোধিনী ॥

পঙ্কজং মনসাদেবী পদ্ব্যস্তমভো যুধিষ্টিরঃ।” ইতি—

তদেতদ্ বৈয়াকরণমতং পঙ্কজমন্তীতাদিতঃ পঙ্কজাতঃ পদ্ব্যস্ত ত্যাগভবশ্চ ত্রায়-মীমাংসাদি-সকলতন্ত্রসিদ্ধত্বেন গৌরবশ্চ প্রামাণ্য ত্বাদনাদেয়ম্, অন্তথাবয়বশক্তেরপি প্রতিবধ্যতাম্যাপ্রবেশাপত্তেন ঘবেন পঙ্কজাতত্ব-প্রকারক-শব্দসামান্যং প্রত্যেব রুঢ়িধিয়ঃ প্রতিবধ্য ত্বশ্চ সুবচন্যং। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)

প্রকাশিকার উক্ত অংশের টিপ্সনীতে স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, 'বা বৃত্তি' ইত্যাদি কারিকা দ্বারা শব্দশক্তি-প্রকাশিকার রচয়িতা যে মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রীপতি দত্তের মত (ড)।

বস্তুতঃ শ্রীপতি দত্তের বহুশতাব্দী পূর্ব হইতে প্রভাকর-পন্থী মীমাংসকগণ যোগরূঢ় নামটিই অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পঙ্কজ শব্দে প্রভাকর ভট্টের মত পদ্যকে বুঝায় প্রয়োগোপাধি দ্বারা ; অর্থাৎ পঙ্কজ শব্দটিকে লোকে পদ্য অর্থে ব্যবহার করে বলিয়াই এই শব্দে পদ্যকে বুঝায়।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রচয়িতা আচার্য্য বিশ্বনাথ পঞ্চাননের মতে বাচক পদগুলি চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ; বিশ্বনাথ পঞ্চাননের মত যথা—(১) যৌগিক, (২) রূঢ়, (৩) যোগরূঢ় এবং (৪) যৌগিকরূঢ় (৫)।

(১) যৌগিক—যে পদ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগহেতু অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে যৌগিকপদ বলা হয় ; যথা—পাচক, পথিক, ইত্যাদি।

(২) রূঢ়—যে পদ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ না বুঝাইয়া লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে অর্থপ্রকাশ করে, তাহার নাম রূঢ়

(ড) অত্রৈব শ্রীপতিদত্তসংবাদমাহ 'বা বৃত্তিরত্যাদিনা।' (টিপ্সনী)

(৫) শব্দং পদং তচ্চতুর্বিধম্, কচিদ্ যৌগিকং, কচিদ্ রূঢ়ং, কচিদ্ যোগরূঢ়ং, কচিদ্ যৌগিকরূঢ়ম্। (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

পদ ; যথা—গো, মণ্ডপ ইত্যাদি । রূঢ় = প্রসিদ্ধ । লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে অর্থ বুঝায় বলিয়াই ইহার এই নাম ।

(৩) যোগরূঢ়—যে পদ যৌগিক এবং রূঢ় এই উভয়বিধ অর্থের সংমিশ্রণে নিজ অর্থ প্রকাশ করে, তাহার নাম যোগরূঢ় ; যথা—পঙ্কজ ইত্যাদি । ‘পঙ্কজ’ শব্দের অর্থ পদ্ম । পদ্ম পঙ্কে জন্মে ; এই কারণে যৌগিকার্থ এখানে আছে । অপরপক্ষে ‘পঙ্কজ’ শব্দটি পঙ্কে জাত অন্ত্যন্ত পদার্থকে বুঝায় না বলিয়া তাহার যৌগিকার্থও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা চলে না । রূঢ়িবশতঃ সে পদ্মকেই বুঝায় বলিয়া যৌগিক এবং রূঢ়, এই দ্বিবিধ অর্থের সংমিশ্রণ এই ক্ষেত্রে আছে । এই কারণেই ইহার নাম যোগরূঢ় ।

(৪) যৌগিকরূঢ়—যে পদ কখনও যৌগিক অর্থে, কখনও বা রূঢ়ার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম যৌগিকরূঢ় ; যথা—উদ্ভিদ ইত্যাদি । উদ্ভিদ শব্দ যখন তরুশুল্মাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন ‘বাহা মাটি ভেদ করিয়া উঠে’ এই যৌগিক অর্থে তাহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ; আবার যখন যজ্ঞবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন সে সম্পূর্ণ রূঢ় ।

যোগরূঢ় এবং যৌগিকরূঢ়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যোগরূঢ় স্থলে একই অর্থে যৌগিক এবং রূঢ় এই উভয়ের গ্রহণ হয়, আর যৌগিক-রূঢ়স্থলে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে উল্লিখিত অর্থদ্বয়ের গ্রহণ হইয়া থাকে ।

যোগরূঢ় ও যৌগিকরূঢ়
পদের পার্থক্য

আচার্য্য জগদীশ তর্কালঙ্কার আবার রূঢ় শব্দগুলিকে
 নৈমিত্তিক, পারিভাষিক এবং ঔপাধিকভেদে
 রূঢ় পদের শ্রেণীবিভাগ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন (৭)।

(১) নৈমিত্তিক—জাতিকে নিমিত্ত করিয়া যে শব্দ
 অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহা নৈমিত্তিক; যথা—গো, অশ্ব
 প্রভৃতি। গোশব্দের উচ্চারণে প্রথমে গোত্বরূপ জাতির
 জ্ঞান হইয়া তাহার পর এই গোত্বজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ
 গোব্যক্তির (যে কোন একটি নির্দিষ্ট গরুর) জ্ঞান হইয়া
 থাকে। অর্থাৎ, গোশব্দের উচ্চারণে কেবল গোত্বরূপ
 জাতির অথবা গোব্যক্তির জ্ঞান হয় না; কিন্তু জাতিবিশিষ্ট
 ব্যক্তির জ্ঞান হয়। এইরূপ ব্যক্তিজ্ঞানের প্রতি জাতিজ্ঞান
 নিমিত্ত বা হেতু : এই জন্য গোশব্দকে নৈমিত্তিক বলা হয়।
 গোত্বরূপ একটি সাধারণ ধর্ম সকল গরুতেই বিद्यমান থাকার
 ফলে প্রথমে গোত্বের জ্ঞান হইয়া পরে গো ব্যক্তির জ্ঞান
 হইতে পারে। অশ্ব প্রভৃতি শব্দের বেলা ও এই নিয়ম (ত)।

(২) পারিভাষিক—যে শব্দ কোন একমাত্র-ব্যক্তিক-

(৭) রূঢ়ং সংস্কৃতবদ্যম, সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্যতে।

নৈমিত্তিকী পারিভাষিকৌপাধিক্যপি তদভিধা ॥

(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, কারিকা—১৭)

(ত) যদ্যম জাত্যবচ্ছিন্নসংস্কৃতবৎ সা নৈমিত্তিকী সংজ্ঞা, যথা—

গো-চৈত্রাদিঃ, সা হি গোত্ব-চৈত্রাদি-জাত্যবচ্ছিন্নমেব গবাদিকমভিধত্তে,
 ন তু গোত্বাদি-জাতিমাত্রম্। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)

গুণবিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহা পারিভাষিক। আকাশ একটি পারিভাষিক শব্দ; কারণ, সে শব্দরূপ-বিশেষগুণ-বিশিষ্ট একটি পদার্থকে বুঝাইয়া থাকে। শব্দ একমাত্র আকাশেরই বিশেষগুণ; ইহা দ্বিতীয় কোন পদার্থে থাকে না (খ)।

(৩) উপাধিক—যে সকল শব্দের শব্দার্থে জাতিভিন্ন অন্ত কোন ধর্ম অনুগত (common) হয়, তাহারা উপাধিক। জাতিভিন্ন অনুগত ধর্মের নাম উপাধি। উদাহরণ, যথা—ভূত, দূত প্রভৃতি সংজ্ঞা। ভূত বলিতে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পাঁচটিকে বুঝায়। কিন্তু অনুগত ধর্ম-ব্যতিরেকে পাঁচটি পরস্পর বিভিন্ন বস্তুকে এক শব্দ কি করিয়া বুঝাইতে পারে? এইস্থানে অনুগত ধর্মই বা কি হইতে পারে? পৃথিবীর বিশেষগুণ—রূপ, রস, পাকজ-স্পর্শ ও গন্ধ। জলের বিশেষগুণ—অভাস্বর গুরুরূপ, শীতল স্পর্শ, মধুর রস, স্নেহ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব। তেজের বিশেষ গুণ—অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পর্শ। আকাশের বিশেষ গুণ—শব্দ। এই বিশেষ গুণগুলির প্রত্যেকেই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মনোভিন্ন অন্ত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য)। তাহা হইলে ইহাদের সাধারণ (অনুগত) ধর্ম বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিশেষগুণবত্ত্ব; অর্থাৎ, সচেতন

(৪) উভয়াবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন-সদ্বৈতবতী সংজ্ঞা পারিভাষিকী; যথা—আকাশ-ডিখাদি, সা হি দ্বিতয়াবৃত্তিধর্মেনৈব শব্দাদিনা ১. রূপেণ তদাশ্রয়মভিধত্তে। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)

দ্রব্যে (আত্মাতে) যাহা অবর্ত্তমান, তাদৃশ বিশেষ গুণই ইহাদের অনুগত (সাধারণ) ধর্ম্ম। ইহা জাতি নহে বলিয়া উপাধি। দূতশব্দের অর্থ বার্ত্তাহর, বার্ত্তাহরণরূপ ধর্ম্মই শক্যতাবচ্ছেদক। ইহা জাতি নহে বলিয়া উপাধি (দ)।

মতান্তরে পারিভাষিক ও ঔপাধিক শব্দগুলির লক্ষণ এবং উদাহরণ ভিন্নরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মতে পারিভাষিক অর্থ—আধুনিক-সঙ্কেতযুক্ত। আধুনিক সঙ্কেত আবার দুই

প্রকার। পিতা, মাতা প্রভৃতি কর্ত্তক পুত্রাদির
 নতাস্তর যে নাম রাখা হয়, তাহা আধুনিক-সঙ্কেত-
 যুক্ত বলিয়া পারিভাষিক; যথা—চৈত্র, দেবদত্ত ইত্যাদি।
 আবার শাস্ত্রকারগণ যে সকল সংজ্ঞা প্রণয়ন করেন, তাহাও
 পারিভাষিক; কারণ, ঐ সকল সংজ্ঞাতেও আধুনিক-সঙ্কেত
 আছে। উদাহরণ, যথা—সিদ্ধি, অভাব, পক্ষতা ইত্যাদি।

যে সকল শব্দের শক্যার্থ উপাধিবিশিষ্ট বস্তুর বোধক,
 এই শেবোক্ত মতে তাহার ঔপাধিক। উদাহরণ, যথা—
 আকাশ পশু প্রভৃতি। উপাধি অর্থ—অন্য-ব্যাবর্ত্তক বিশেষ
 ধর্ম্ম। আকাশের মধ্যে শব্দরূপ অন্যব্যাবর্ত্তক একটি বিশেষ

(দ) ঔপাধিকী অনুগতোপাধিনা যা প্রবর্ত্ততে।

(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, কারিকা—২২)

যা চানুগতোপাধ্যবচ্ছিন্নে সঙ্কেতবতী সংজ্ঞা সা ঔপাধিকী ;
 যথা—ভূতদূতাদি, সা হি সচেতনার্ভুতিবিশেষগুণবদ্ব-বার্ত্তাহরকত্যা-
 নুগতোপাধিপূরঙ্কারেণৈব প্রবর্ত্ততে। (ঐ ব্যাখ্যা)

ধর্ম আছে। আকাশ বলিতে সেই বিশেষ-ধর্মবিশিষ্ট পদার্থকেই বুঝায়। এইরূপ পশু বলিতেও পশু বা চরণ-চতুষ্টয়াদিবস্বরূপ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট প্রাণীকেই বুঝায়। প্রথমোক্ত মতে ইহারাই পারিভাষিক নামে অভিহিত হইয়াছে। নৈমিত্তিক শব্দসম্বন্ধে উভয় মতই এক প্রকার (খ)।

আচার্য্য জগদীশ তর্কালঙ্কার যোগরূঢ় শব্দের দুইটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—(১) সমাসজাত, যথা—কৃষ্ণসর্প ইত্যাদি, এবং (২) তদ্ধিত প্রত্যয়জাত, যথা—বাসুদেব প্রভৃতি। কৃষ্ণসর্প শব্দে যোগরূঢ় পদের শ্রেণী-বিভাগ কাল রং এর একটি বিশেষ-জাতীয় সর্পকে বুঝায়; যে কোন কৃষ্ণবর্ণ সর্পকে বুঝায় না (ন)। বাসুদেব শব্দেও বাসুদেবের পুত্রমাত্রকেই বুঝায় না; বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইয়া থাকে।

উক্ত আচার্য্যের মতে যৌগিক শব্দগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।—(১) সমাসজাত, যথা—সমাস-নিষ্পন্ন পদ ধব-খদিরাদি, (২) তদ্ধিতজাত, যথা—রাবণি, দাশরথি ইত্যাদি, এবং (৩) কুৎপ্রত্যয়জাত, যথা—দন্ত, ভুরু প্রভৃতি।

(খ) যদ্বাধুনিক-সঙ্কেতশালি শ্রীং পারিভাষিকম্।

জাত্যা নৈমিত্তিকং প্রোক্তমৌপাধিকমুপাধিনা ॥

(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, কারিকা—২৩)

(ন) কৃষ্ণসর্পঃ স বিজ্ঞেয়ো যেন দৃষ্টো ন জীবতি।

প্রাচীনেরা বলেন—‘এই শব্দ এই অর্থের বোধক হইবে’
 এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই মুখ্যার্থ-(অভিধালভ্যার্থ) নির্ণয়ের হেতু
 বা নিয়ামক। এই ঈশ্বরেচ্ছা সঙ্কেত নামেও কথিত হয়।
 এই ঈশ্বরেচ্ছা বা সঙ্কেত কেমন করিয়া জানা যায়? মানুষ
 তো ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না; তাঁহার
 ঈশ্বরেচ্ছারূপ সঙ্কেত কথাও কদাপি শুনে না। এবং বিধ ঈশ্বরের
 ইচ্ছা জানা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে আচার্য্য-
 গণ বলেন—সঙ্কেত বা ঈশ্বরেচ্ছা নানাবিধ
 লৌকিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আত্মপ্রকাশ
 করে।

সঙ্কেত-গ্রহণের
 উপায় সমূহ

প্রথমতঃ—ব্রহ্ম লোকের ব্যবহার দেখিয়া বালক-বালিকারা
 শব্দের অর্থ বুঝিয়া থাকে। মনে করা যাউক, একজন
 প্রাচীন লোক একটি তরুণকে ডাকিয়া বলিলেন—গরুটিকে
 লইয়া আস। তখন সেই তরুণ ব্যক্তি প্রাচীনের নির্দেশ
 অনুসারে গরু নামক জন্তুটিকে লইয়া আসিল। তারপর
 উক্ত প্রাচীন ব্যক্তি আবার বলিলেন—‘ঘোড়াটিকে লইয়া
 আস এবং গরুটিকে লইয়া যাও।’ তাঁহার কথা শুনিয়া
 সেই তরুণ ব্যক্তি ঘোড়া নামক জন্তুটিকে আনিল এবং
 পূর্বে আনীত গরুটিকে লইয়া গেল। এই কার্য্যগুলি
 দেখিয়া নিকটবর্তী শিশুরা গরু ও ঘোড়া
 চিনিতে পারিল, এবং লইয়া আসা ও লইয়া
 যাওয়া ক্রিয়া দুইটির অর্থও জানিতে পারিল। আচার্য্যগণ

ব্রহ্মব্যবহার

এই উপায়কে বুদ্ধব্যবহার নাম দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ—অন্য শব্দের সান্নিধ্যবশতঃও শব্দের অর্থ অবগত হওয়া যায়। সাধারণতঃ অনেকার্থ-শব্দ-বিষয়েই এই দ্বিতীয় উপায়টি প্রযোজ্য। ‘অম্বর
অম্বরপদের সান্নিধ্য মেঘাচ্ছন্ন’ বলিলে বস্ত্রের পক্ষে মেঘাচ্ছন্ন হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া অম্বর শব্দে আকাশকেই বুঝাইবে; আবার ‘অম্বর পরিধান কর’ (অম্বরং পরিধেহি) বলিলে আকাশকে পরিধান করা সম্ভব নহে বলিয়া অম্বরশব্দে বস্ত্রকেই বুঝাইবে।

তৃতীয়তঃ—জ্ঞানী লোকের কথা শুনিয়া সাধারণ লোক শব্দের অর্থ অবগত হয়। যে কখনও ঘোড়া দেখে নাই, তাহার সম্মুখে সহসা একটি ঘোড়া উপস্থিত
আপ্তোপদেশ হইলে এই জন্তুটির নাম জানিবার জন্য স্বভাবতঃই উক্ত লোকটির কৌতূহল জন্মিবে। তখন সে কোন জ্ঞানী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার নাম অবগত হয়। প্রাচীন আচার্য্যগণ এই উপায়টিকে আপ্তোপদেশ নামে অভিহিত করেন। আপ্ত অর্থ—জ্ঞানী (প)। সহজ

(প) প্রকৃতবাক্যার্থগোচর-যথার্থজ্ঞানবানাপ্তঃ। (তর্কামৃতম্)

আপ্তোপদেশাৎ প্রামাণিকবচনাৎ। (সাহিত্যদর্পণবিবৃতি)

আপ্তস্ত যথাভূতশ্রুতশ্রোত্রোপদেষ্টো পুরুষঃ। (তর্কভাষা)

ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিম্পা-করণাপাটবরূপ-দোষচতুষ্টয়রহিত-

মাণ্ডল্যম্। (গ্রন্থান্তরে)

কথায় বলিতে গেলে, যে ব্যক্তির কথায় সকলেই বিশ্বাস করে, তিনিই আপ্ত। উপদেশ অর্থ—উচ্চারণ। জ্ঞানী ব্যক্তির মুখের উচ্চারণ শুনিয়া অন্তরের শব্দার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মে বলিয়া এই উপায়কে আপ্তোপদেশ বলা হয়।

আচার্য্য বিশ্বনাথ তাঁহার ‘সাহিত্যদর্পণ’ নামক গ্রন্থে দৃষ্টান্তদ্বারা সঙ্কেত-গ্রহণের এই ত্রিবিধ উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন (ক)।

উল্লিখিত তিনটি উপায় ছাড়া অন্যান্য উপায়েও শব্দের সঙ্কেত অবগত হওয়া যায়। আচার্য্যগণ বলেন—“প্রথমে

বুদ্ধব্যবহার দর্শনেই শব্দার্থের জ্ঞান জন্মে।
অন্যান্য উপায় উপমান প্রভৃতি অন্যান্য উপায়, তাহার পর গৃহীত হইয়া থাকে। (ব)”

(ক) উত্তম-বৃদ্ধেন মধ্যমবুদ্ধমুদিশু ‘গানানয়’ ইত্যুক্তে তং গবানয়ন-প্রবৃত্তমুপলভ্য বালোহশ্চ বাক্যশ্চ ‘সান্নাদিমং গিণ্ডানয়নমর্থঃ’ ইতি প্রথমং প্রতিপত্ততে, অনন্তরঞ্চ ‘গাং বধান’ ইত্যাদাবাপোষাপাত্যাং গৌশব্দশ্চ ‘সান্নাদিমানর্থঃ’ আনয়নপদশ্চ চ ‘আহরণমর্থঃ’ ইতি সঙ্কেত-মবধারণয়তি। কচিচ্চ প্রসিদ্ধপদসমভিব্যাহারাং, যথা—‘ইহ প্রভিন্ন-কমলোদরে মধুনি মধুকরঃ পিবতি’ ইত্যত্র। কচিদাপ্তোপদেশাং, যথা—‘অয়মশ্বশব্দবাচ্যঃ’ ইত্যত্র। তঞ্চ সঙ্কেতিতমর্থঃ বোধয়ন্তী শব্দশ্চ শব্দান্তরানন্তরিতা শক্তিরভিধা নাম। (সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(ব) সঙ্কেতশ্চ গ্রহঃ পূর্ব্বং বুদ্ধশ্চ ব্যবহারতঃ।

পশ্চাদেবোপমানাত্তে: ... ॥

(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, কারিকা—২০)

সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় যে, বুদ্ধব্যবহার-দর্শনেই
 শিশুর প্রাথমিক সঙ্কেত গৃহীত হইয়া থাকে;
 বুদ্ধব্যবহারের অস্বীকৃতি কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহাতে
 আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট বলেন, শিশুকে
 তাহার মাতাপিতা অঙ্গুলিদ্বারা সম্মুখস্থ কোন বস্তু দেখাইয়া
 যখন সেই বস্তুর বাচক নামের উচ্চারণ
 করেন, তখনও শিশু বুঝিতে পারে যে,
 অঙ্গুল্যগ্রনির্দিষ্ট বস্তুটি উচ্চারিত নামের বাচ্য (ভ)।

এইভাবে সঙ্কেত-গ্রহণের সময়ে কোন বিধিলকারযুক্ত
 শব্দপ্রয়োগের আবশ্যক না হওয়ায় জয়ন্তভট্ট ইহাকে
 বুদ্ধব্যবহাররূপে স্বীকার করেন না। সুতরাং জয়ন্ত ভট্টের
 মতে বুদ্ধব্যবহারই প্রাথমিক সঙ্কেত-গ্রহণের
 একমাত্র হেতু নহে। আচার্য্য রামানুজও
 তাঁহার শ্রীভাষ্যে এই কথাই বলিয়াছেন।
 অঙ্গয়দীক্ষিতের মত মহামতি অঙ্গয়দীক্ষিতও তাঁহার 'পরিমল'
 গ্রন্থের (ভামতীর টীকা, নির্ণয়সাগরসংস্করণ) ১৩২ পৃষ্ঠায়
 অনুরূপ যুক্তিরই অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধ-
 ব্যবহারের বিপক্ষে আচার্য্যগণের এইসকল
 উক্তি প্রণিধানযোগ্য। 'সঙ্কেতশ্চ গ্রহঃ পূর্বঃ'

(ভ) অঙ্গুলাগ্রেন নির্দিষ্ট কক্ষিদর্শং পুরঃস্থিতম্।

ব্যুৎপাদয়ন্তো দৃশ্যন্তে বালানশ্চদ্বিধা অপি ॥

[আয়মঞ্জরী (চৌখাম্বা), প্রমাণ-প্রকরণ, ২২৫ পৃষ্ঠা]

ইত্যাদি কারিকার রচয়িতা শাব্দিকপ্রবর জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং আলঙ্কারিকগণ সম্ভবতঃ উল্লিখিত জয়ন্তভট্ট প্রদর্শিত উপায়টিকেও বুদ্ধব্যবহারের অন্তর্গত বলিয়া নিবেচনা করিয়াছেন।

ঈশ্বরেচ্ছাই সঙ্কেতশব্দবাচ্য কি না, এই সম্বন্ধে আবার আচার্য্যগণের অনেকে নানারূপ প্রশ্নের সম্বন্ধে সম্বন্ধে মতভেদ অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—

দেবদত্ত নামক লোকটি যখন তাহার পুত্রের নাম ‘রাম’ বা ‘শ্যাম’ রাখে, তখন ইহাতে তো ঈশ্বরেচ্ছা থাকে না; অথচ উক্ত রাম বা শ্যাম শব্দে উল্লিখিত দেবদত্তের পুত্রটিকেই বুঝায় বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা হইলে তো কেবল ঈশ্বরেচ্ছাই সঙ্কেত হইল না; মানুষের ইচ্ছাও সঙ্কেত হইয়া পড়িল। এই সংশয় উত্থাপন করিয়া উল্লিখিত আচার্য্যগণ বলিতে চাহেন যে, ইচ্ছামাত্রেই সঙ্কেত বা অভিধেয়ার্থ-নিয়ামক। কিন্তু এই শেষোক্ত আচার্য্যগণের মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

আলোচনা
মানুষের ইচ্ছামাত্রেই যদি সঙ্কেত হইত, তাহা হইলে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন শব্দদ্বারা যে কোন বস্তুকে বুঝাইতে পারিত। কিন্তু, তাহা ত পারে না। কেহ যদি ঘোড়াকে গরু বলিয়া বা মাটিকে জল বলিয়া চালাইতে চায়, তাহা হইলে লোকে তাহাকে উদ্ভাদ ভিন্ন আর কিছুই

বলিবে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের ইচ্ছামাত্রেই সঙ্কেত নহে। দেবদত্ত তাহার পুত্রের নাম 'রাম' রাখিলে লোকে এই কারণে তাহা স্বীকার করিয়া লয় যে, পূর্বেও রাম নামে অন্য লোক ছিল, কাজেই এখনও কোন মানুষের এই নাম রাখা অসমীচীন হইবে না।

জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা সঙ্কেতরূপে গৃহীত হইতে পারে বটে; কিন্তু, তাহা বস্তুতঃ ঈশ্বরেচ্ছারই রূপান্তর। ঈশ্বর নিরাকার; কাজেই তিনি নিজে মুখ দিয়া কিছু বলেন না; জনসাধারণের ইচ্ছারূপেই ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের গোচরীভূত হয়।

অন্যান্য আচার্য্যগণ বলেন—রাম, শ্যাম প্রভৃতি আধুনি নামেও ঈশ্বরেচ্ছারূপ সঙ্কেত আছে। 'একাদশ দিবসে পিতা পুত্রের নাম রাখিবেন' এই শাস্ত্রীয় নির্দেশই উক্ত ঈশ্বরেচ্ছা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। শাস্ত্রের নির্দেশ ঈশ্বরের নির্দেশ বলিয়া গৃহীত হয়। শাস্ত্র কেবল পুত্রের নাম রাখিবার জন্য পিতাকে নির্দেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই কিভাবে নাম রাখিতে হইবে, তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন অতএব, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যখন পিতা পুত্রের নাম রাখেন, তখন সেই নামের অর্থপ্রকাশে ঈশ্বরের ইচ্ছা নাই এমন কথা কি করিয়া বলা যায়?

বস্তুতঃ, বর্তমান যুগে হিন্দুদের মধ্যেও অধিকাংশ লোক ছেলেমেয়েদের নাম রাখিবার সময় শাস্ত্রের নির্দেশ মানি

চলেন না ; অথচ, তাঁহাদের রাখা ঐ সকল নাম সমাজে ব্যাপকভাবেই প্রচলিত আছে । বিশেষতঃ, অহিন্দুরা শাস্ত্রের উল্লিখিত নির্দেশের কোন সংবাদই রাখেন না ; কিন্তু তাঁহাদের নামসমূহও নিরর্থক নহে । সুতরাং এই বিষয়ে আমার প্রাপ্ত যুক্তিই (জনসাধারণের ইচ্ছাই ঈশ্বরেচ্ছা) একমাত্র সমাধান বলিয়া আমি মনে করি ।

নানার্থশব্দস্থলে যখন অন্যশব্দের সান্নিধ্যহেতু কোন শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থ ব্যবহৃত হয়, তখন সেখানে ঈশ্বরেচ্ছা বলিব, না বাক্যের প্রয়োগকর্তা মানুষের ইচ্ছা স্বীকার করিব—এই প্রশ্ন উঠিতে পারে । ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, নানার্থশব্দের যে নির্দিষ্ট কয়েকটি অর্থ আছে, তাহার প্রত্যেকটিই ঈশ্বরেচ্ছা অনুসারে নির্ণীত হইয়াছে । বাক্যের প্রয়োগকর্তা সেই সকল অর্থের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়াছেন । অশ্বর শব্দের যে দুইটি অর্থ (আকাশ ও বস্ত্র) আছে, তাহার অতিরিক্ত কোন অর্থ কেহ এই শব্দটিকে ব্যবহার করিতে পারেন না । অতএব এই স্থলেও ঈশ্বরেচ্ছাই গৃহীত হইতেছে । নানার্থশব্দ একই ক্ষেত্রে সকল অর্থ বুঝাইবে—ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে । যদি এরূপ হইত, তবে ক্ষতি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে তাদৃশ ব্যবহার পাওয়া যাইত ।

আপ্তোপদেশস্থলেও আপ্তব্যক্তি শব্দের ঈশ্বরেচ্ছা-নির্দিষ্ট যে অর্থ নিজে জানিয়াছেন, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ

করেন—এই মাত্র প্রভেদ ।

আস্তিকগণের মতে ঈশ্বরেচ্ছা-ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না । ক্ষেত্র-কর্ষণের জন্য কৃষকের জলের প্রয়োজন হইবে সে যেমন ত্রিবিধ উপায়ে জল পাইতে পারে [বৃষ্টির জল, নালা কাটিয়া আনীত নদী প্রভৃতির জল, উদাহরণস্বরূপ সমর্থন অথবা যন্ত্রের সাহায্যে উখিত নিকটবর্তী জলাশয়ের জল], কিন্তু যে উপায়েই সে জল লাভ করুক না কেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই উহা লাভ করিয়া থাকে; তেমনি ঈশ্বরেচ্ছারূপ অভিধাও ত্রিবিধ উপায়ে আমাদের কর্তৃক গৃহীত হয় ।

শাক্তিকগণের মতে শক্তিগ্রহের (সঙ্কেতিতার্থগ্রহণের) উপায় আটটি ; (ম) যথা—ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, বুদ্ধ-ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবরণ, এবং প্রসিদ্ধ শক্তিগ্রহ সম্বন্ধে পদের সান্নিধ্য । আপ্তবাক্য, বুদ্ধ ব্যবহার শাক্তিকগণের মত এবং প্রসিদ্ধপদ-সান্নিধ্যের উদাহরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে । বাকী পাঁচটির উদাহরণ দেখান হইতেছে ।

ব্যাকরণ—‘প্রচুর ধন আছে ইহার’ এই অর্থে ‘ধন’শব্দের উত্তর ব্যাকরণের বিধান অনুসারে মতুপ্ প্রত্যয় হয়, এবং মতুপের ম স্থানে ব আদেশ হইয়া ‘ধনবান্’ পদটি সাধিত হইয়া থাকে । এইরূপে ‘স্বস্বভাবে দেখা ইহার স্বভাব’ এই

(ম) শক্তিগ্রহঃ ব্যাকরণোপমান-কোষাপ্তবাক্যাদ্ ব্যবহারতচ্চ ।
বাক্যশ্র শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যাতঃ সিদ্ধপদশ্চ বুদ্ধাঃ ॥

অর্থে সূক্ষ্মউপপদে দৃশ্-ধাতুর উত্তর গিনি প্রত্যয় হইয়া সূক্ষ্মদর্শী পদটি সাধিত হয়। কোন্ অর্থে কোন্ প্রত্যয়টি বিহিত হইল, তাহা ব্যাকরণ হইতে জানা যায় বলিয়া এই সকল শব্দের অর্থনির্ণয়ে ব্যাকরণই হেতুরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

উপমান—‘গবয় দেখিতে গরুর মত’ এই বাক্য শুনিয়া যখন কোন গ্রাম্য লোক বনে যায়, তখন বনের মধ্যে গরুর মত আকৃতি-বিশিষ্ট জন্তু-বিশেষকে দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, উহা গবয়। উল্লিখিত সাদৃশ্যসূচক বাক্যই তাহার গবয়-জ্ঞানের প্রতি হেতু। সাদৃশ্য এবং উপমান একার্থ-বোধক।

কোষ—কোষশব্দের অর্থ অভিধান। যে ব্যক্তি কোন একটি শব্দের অর্থ জানে না, সে অভিধান দেখিয়া সেই শব্দের অর্থ জানিয়া লয়; এই ব্যবহার সর্বজনবিদিত। এই উপায়ে যে শব্দার্থের জ্ঞান জন্মে, তাহার হেতু কোষ বা অভিধান।

বাক্যশেষ—যব শব্দের দুইটি অর্থ। আর্ঘ্যগণ দীর্ঘশুক অর্থে ইহার প্রয়োগ করেন, এবং স্নেহেরা প্রিয়সুতগুল অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকে। ‘যবময়শ্চরুভবতি’ বলিলে যবশব্দ কোন্ অর্থে গৃহীত হইবে—এই সন্দেহ উপজাত হয়।
তখন—

“অথাত্মা! ওষধয়ো গ্নায়ন্তেহুথৈতে মোদমানাস্তিষ্ঠন্তি।”

এই শ্রোত বাক্যশেষ, অথবা

বসন্তে সর্বশস্যানাং জায়তে পত্রশাতনম্ ।

মোদমানাশ্চ তিষ্ঠন্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ ॥”

এই স্মার্ত্ত বাক্যশেষ হইতে যবশব্দে দীর্ঘশূককে বুঝায়; কিন্তু প্রিয়দ্রুতগুলকে বুঝায় না । প্রিয়দ্রুতগুল অর্থে যাঁহার যবশব্দের প্রয়োগ করেন, শাস্ত্রকারদের মতে তাঁহার ভ্রান্ত (য) ।

ইহাকে কেন বাক্যশেষ বলা হয়, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যিক । কেবল মিলিতার্থবোধক পদসমষ্টি যে বাক্য (র), তাহা নহে ; বাক্যসমষ্টিও বাক্য বা মহাবাক্য রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে (ল) ; ফলে, কোন গ্রন্থের একটি সমগ্র প্রকরণ, বা সমগ্র গ্রন্থখানিও মহাবাক্য (বৃহৎবাক্য) রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে । উপরোক্ত ‘যবময়শ্চরুভবতি’ কথাটি বেদের যে প্রকরণে আছে, সেই প্রকরণেই ‘অথাত্তা ওষধয়ঃ...’ ইত্যাদি কথাটিও আছে ; কাজেই, ইহা প্রৌঢ় বাক্যশেষ বা বাক্যের অবশিষ্টাংশরূপে বিবেচিত হয় । স্মৃতি বস্তুতঃ শ্রুতির ব্যাখ্যাস্বরূপ ; এই জন্যই ‘বসন্তে...’ ইত্যাদি স্মৃতিবচনটিকে শ্রুতির বাক্যশেষরূপে গ্রহণ করা হয় ।

বিবরণ—সমানার্থক অন্য পদদ্বারা কোন পদের অর্থ

(য) কদৌ তু শক্তিভ্রমাৎ প্রয়োগঃ । (সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী)

(র) সংহত্যর্থমভিধতি পদানি বাক্যম্ । (প্রাচীন যত্ন বাক্যাং শ্রাদ্ধযোগ্যতাকাজ্জ্ঞাসন্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ । (সাহিত্যদর্পণ)

(ল) বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যম্ । (সাহিত্যদর্পণ)

কখনকে বিবরণ বলা হয়। এক ব্যক্তি বলিল—‘ঘট আছে’।
 নিকটবর্তী শ্রোতা ঘটশব্দের অর্থ জানে না; সে জিজ্ঞাসা
 করিল—ঘট অর্থ কি? উত্তর হইল—কলস। শ্রোতা
 কলস শব্দের অর্থ জানে; কাজেই, কলস শব্দের উচ্চারণ
 শুনিয়া তাহার ঘটশব্দের অর্থজ্ঞান হইল।

বস্তুতঃ ব্যাকরণ, উপমান এবং কোষ—
 বুদ্ধব্যবহারাদি-
 উপায়ত্রয়ের এই তিনটিকে আপ্তবাক্যের অন্তর্গত
 মধ্যে অন্যান্য বলিয়াই ধরা যায়। ব্যাকরণ এবং কোষ
 উপায়ের প্রবেশ আপ্ত ব্যক্তিগণ-কর্তৃকই রচিত, এবং ‘গবয়
 দেখিতে গরুর মত’ এই উপমানসূচক বাক্যের বক্তাও আপ্তই
 বটেন; কারণ, আপ্ত ছাড়া অন্যের কথা লোকে বিশ্বাস
 করে না। ‘বাক্যশেষ’ নামক উপায়টিকে ‘প্রসিদ্ধ পদের
 সান্নিধ্য’ নামক উপায়ের মধ্যে অনায়াসেই অন্তর্নিহিত করা
 যায়। বিবরণ নামক উপায়টিকেও অনায়াসেই আপ্তবাক্য
 হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ
 সঙ্কেতগ্রহণের যে তিনটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন,
 শাব্দিকগণকর্তৃক প্রদর্শিত অতিরিক্ত উপায়গুলি সেই তিনটি
 উপায়ের মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে।

শব্দের আকার দেখিয়াই তাহার অর্থ-
 নানার্থ-শব্দের
 অর্থনির্ণয় নির্ণয় করা সকল সময়ে চলে না। নানার্থ-
 শব্দ-স্থলে অন্যপদের সান্নিধ্য অনেক

ক্ষেত্রেই অর্থনির্ণয়ে সহায়তা করে বটে, কিন্তু এমনও স্থান আছে, যেখানে অন্যপদের সান্নিধ্য নাই। স্থান, কাল প্রভৃতিই ঐ সকল শব্দের অর্থনির্ণয়ে সাহায্য করে। সৈন্ধব শব্দের এক অর্থ 'সিন্ধুদেশীয় অশ্ব', অন্য অর্থ 'সমুদ্রজাত লবণ'। কোন ব্যক্তি আহারে বসিয়া যদি বলে 'সৈন্ধব আনয়ন কর,' তাহা হইলে তখন তাহাকে লবণই দেওয়া হয়। আবার রণসাজে সজ্জিত সেনাপতি যুদ্ধগমনের প্রাক্কালে যদি সেই বাক্যটিই উচ্চারণ করেন, তবে তখন সিন্ধুদেশীয় অশ্বই তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করা হয়। 'চিত্রভানু' শব্দের দুই অর্থ—একটি সূর্য্য, এবং অপরটি অগ্নি। দিনের বেলা যদি কেহ বলে 'চিত্রভানু দীপ্তি পাইতেছেন,' তাহা হইলে লোকে চিত্রভানু শব্দে সূর্য্যকেই বুঝিয়া থাকে; কিন্তু এই একই বাক্য রাত্রিতে উচ্চারণ করিলে তখন চিত্রভানু শব্দে অগ্নিকে বুঝায়।

আচার্য্যগণ বলেন—অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, ঔচিত্য, দেশ এবং কাল দেখিয়া শব্দের অর্থ নির্ণীত হয়, কেবল রূপ দেখিয়া নহে (ব)।

নানার্থশব্দস্থলেই এই সকল হেতু শব্দের বাচ্যার্থ-নির্ণয়ে নিয়ামক হইয়া থাকে। অর্থ=প্রয়োজন। প্রকরণ=প্রসঙ্গ। লিঙ্গ=চিহ্ন। ঔচিত্য=যে অর্থ নির্ণয় করা

(ব) অর্থাৎ প্রকরণালিঙ্গাদৌচিত্যাদেশকালতঃ।

শব্দার্থাশ্চ বিভজ্যন্তে, ন রূপাদেব কেবলম্॥

হইতেছে, তাহা সঙ্গত কি না, ইহার বিচার। আচার্য্যগণ ইহাকে যোগ্যতা নামেও অভিহিত করিয়াছেন। দেশ = স্থান। কাল = সময়। ক্রমশঃ এইগুলির উদাহরণ দেখান হইতেছে।

অর্থ—‘মুক্তির জন্য স্থাণুকে ভজনা কর’—এই বাক্যে ভজনা করার প্রয়োজন ‘মুক্তিলাভ’। স্থাণুশব্দের দুই অর্থ; একটি ‘ডালপালাহীন গাছের গুঁড়ি’, এবং অপরটি ‘শিব’। ডালপালাহীন গাছের গুঁড়ির ভজনাদ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব নহে; কাজেই উক্ত বাক্যে স্থাণুশব্দে শিবকেই বুঝাইতেছে। ভজনার প্রয়োজন মুক্তিই এই স্থলে অর্থের নিয়ামক হইল।

প্রকরণ—আহারে বসিয়া ‘সৈন্ধব আনয়ন কর’ বলিলে সৈন্ধব শব্দে লবণের প্রতীতি প্রকরণাধীন হইয়া থাকে। অন্য ভাবেও প্রকরণের উদাহরণ দেখান যাইতে পারে; যেমন—লঙ্কাযুদ্ধে ‘রাম’ শব্দের প্রয়োগ দেখিলে ইহাদ্বারা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্রকেই বুঝায়, আবার ক্ষত্রিয়-নিধন-প্রসঙ্গে ‘রাম’ শব্দের উল্লেখ পরশুরামকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

লিঙ্গ—লিঙ্গ অর্থ চিহ্ন। মকরধ্বজ শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে; (১) কামদেব, (২) মকরাকৃতি পতাকা, এবং (৩) সমুদ্র। ‘মকরধ্বজ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন’ বলিলে মকরাকৃতি পতাকা বা সমুদ্রের পক্ষে ক্রোধ করা সম্ভব নহে বলিয়া মকরধ্বজ শব্দ কামদেবকেই বুঝায়। এই স্থলে ক্রোধরূপ

চিহ্নই অর্থ নির্ণয়ের সহায়ক হইয়াছে (শ) ।

উচিত্য—‘তরকারীতে সৈন্ধব দিবে’ বলিলে সৈন্ধব শব্দে লবণকেই বুঝাইবে ; কারণ তরকারীর মধ্যে ঘোড়া দেওয়ার চিন্তা সম্পূর্ণ অসঙ্গত । উচিতী শব্দের অর্থ ‘যোগ্যতা’ (য) । যোগ্যতানুযায়ী অর্থ নির্ণীত হয় বলিয়া এই উপায়টিকে উচিত্য বলা হয় ।

দেশ—‘সোম’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে ; যথা—
(১) চন্দ্র, (২) কর্পূর, এবং (৩) লতাবিশেষ । ‘আকাশস্থ সোমের দিকে দৃষ্টিপাত কর’ বলিলে, কর্পূর বা সোমলতার পক্ষে আকাশে অবস্থিতি সম্ভবপর নহে বলিয়া ‘সোম’ শব্দে চন্দ্রকেই বুঝায় । এই স্থলে আকাশরূপ দেশ বা স্থানই অর্থ নির্ণয়ের হেতু ।

(শ) মকরধ্বজপদং কর্মধারয়-বহুব্রীহিভ্যামনেকার্থকম্ । কোপস্ত মকরাকারধ্বজেহসম্ভবাং কামশ্চৈব বোধকম্ । কেচিত্ত্বু “মকরধ্বজপদং কামসমুদ্রাদনেকার্থকম্ । কোপস্ত কামশ্চৈব চিহ্নম্ । সমুদ্রাধিষ্ঠাত্ত্ব কোপসম্ভবেহপি বিরহিবিষয়ঃ কোপোহত্র বোধ্যঃ” ইত্যাহঃ । তত্র ‘সম্প্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং....’ ইত্যাদি প্রয়োগবলান্নাকরধ্বজস্ত সমুদ্রে শক্তিকল্পনেহপি তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবোধস্ত লক্ষণ্যৈবেতি তত্র কোপ সম্ভবশ্রাকিঞ্চিংকরত্বাং কোপবিশেষপ্রতিসন্ধানস্ত মকরধ্বজপদার্থবিশেষ প্রতিসন্ধানাধীনতয়া তস্ত প্রথমমহুপস্থিতৌ নিয়ন্ত্রকহাযোগাচ্চ ।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, রামচরণটীকা)

(য) উচিতী—যোগ্যতা । (রসগঙ্গাধর)

উচিতী—অহঁতা । (কাব্যপ্রদীপ)

কাল—‘চিত্রভানু দীপ্তি পাইতেছেন’—এই বাক্য দ্বারা কালের উদাহরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

সঙ্কেত-গ্রহণের উপায় সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা সঙ্কেত-গ্রহণের হইল। এক্ষণে সঙ্কেত-গ্রহণের ক্ষেত্র ক্ষেত্র-সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

মীমাংসকদের মতে কেবলমাত্র জাতিতেই সঙ্কেত গৃহীত হয়; অতএব, তাঁহাদের মতে সঙ্কেত-গ্রহণের ক্ষেত্র মাত্র একটি। এই কারণেই মীমাংসকেরা জাতি-শক্তিবাদী জাতিশক্তিবাদ নামে পরিচিত। মীমাংসার সূত্র ও ভাষ্যসমূহে জাতি অর্থে আকৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় (স)।

কেহ কেহ আবার কেবল ব্যক্তিতে, কেহ বা ব্যক্তিবিশিষ্ট জাতিতে, অথবা জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শব্দের শক্তিগ্রহ ব্যক্তিশক্তিবাদ ও স্বীকার করিয়া থাকেন (হ)। গ্রন্থের অন্ত্যন্ত নত কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই সম্বন্ধে বিস্তৃত

(স) আকৃতিস্ত ক্রিয়ার্থত্বাৎ। (জৈমিনিবৃত্ত ১।৩।৩৩)
তস্মাদাকৃতিবচনঃ শব্দ ইত্যেতজ্জ্যায়ঃ। (শাবরভাষ্য ১।৩।৩৩)
অত উপপন্নঃ জৈমিনিবচনমাকৃতিঃ শব্দার্থ ইতি। যথা চাকৃতিঃ শব্দার্থস্তথোপরিষ্টান্নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যাম ইতি।
(শাবরভাষ্য ১।১।৫)

(হ) কিং জাতিরেব শব্দার্থো ব্যক্তিरेবাথ বোভয়ম্।
কিং বিকল্লোহথ সম্বন্ধঃ সমুদায়ো নিরূপ্যতাম্॥
জাতিব্যক্তিবিশিষ্টা বা ব্যক্তির্জাতিবিশেষিতাঃ॥
(তত্ত্ববাস্তিক ১।৩।৩৩)

আলোচনায় বিরত রহিলাম। জাতিবিশিষ্ট-ব্যক্তি সম্বন্ধে
কিঞ্চিৎ আলোচনা শব্দশক্তি-প্রকাশিকার আলোচনা প্রসঙ্গে
করা হইয়াছে।

পাণিনীয় মহাভাষ্যের রচয়িতা মহামুনি পতঞ্জলি হইতে
আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের শাব্দিক ও আলঙ্কারিক
আচার্য্যগণের প্রায় সকলেই মনে করেন,
মহাভাষ্যের মত সঙ্কেত গ্রহণের ক্ষেত্র চারিটি ; যথা—জাতি,
গুণ, ক্রিয়া, এবং দ্রব্য (ক্ষ)।

প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহ তাঁহার কাব্যালঙ্কার নামক
গ্রন্থে সঙ্কেত-গ্রহণের ক্ষেত্র অনুসারে জাত্যাতিভেদে শব্দের
চতুর্বিধতা স্বীকার করিয়াছেন। অধিকন্তু
ভামহের মত তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, কাহারও
মতে উক্ত চারিপ্রকারের অতিরিক্ত বদৃচ্ছাশব্দ নামে শব্দের
আর একটি প্রকারভেদ স্বীকৃত হয়, এবং তাহার
উদাহরণরূপে 'ডিথ' প্রভৃতি শব্দ প্রদর্শিত হইয়া
থাকে (ক)।

ব্যক্তিবিবেককার মহিম ভট্ট জাতি প্রভৃতি চারিটি ক্ষেত্রই

(ক্ষ) গোঃ গুরুশলো ডিথ ইত্যাদৌ চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ।
(মহাভাষ্য)

(ক) দ্রব্যক্রিয়াজাতিগুণভেদান্তে চ চতুর্বিধাঃ।

বদৃচ্ছাশব্দমপ্যাগে ডিথাদি প্রতিজানতে ॥

(কাব্যালঙ্কার, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কারিকা—২১)

স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহাও জানাইয়া-
 নহিন ভট্টের মত ছেন যে, কাহারও কাহারও মতে কেবল-
 মাত্র ক্রিয়াতেই সঙ্কেত গৃহীত হয় (খ)।

আলঙ্কারিক প্রবর মন্মটভট্ট জাত্যাতিভেদে সঙ্কেত-গ্রহণের
 চারিটি ক্ষেত্রই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি
 নন্মট ভট্টের মত শ্রদ্ধাসহকারে মতান্তররূপে মীমাংসকদের
 মতটিরও উল্লেখ করিয়াছেন (গ)

সাহিত্যদর্পণের রচয়িতা আচার্য্য বিশ্বনাথ
 দৃঢ়ভাবে জাতিপ্রভৃতি চারিটি ক্ষেত্রই সমর্থন
 করিয়াছেন (ঘ)।

আলঙ্কারিকদের মধ্যে কেবলমাত্র জয়দেব তাঁহার রচিত
 ‘চন্দ্রালোক’ নামক গ্রন্থে সঙ্কেত গ্রহণের ছয়টি ক্ষেত্র প্রদর্শন

(খ) তত্র সত্ত্বপ্রধানানি নামানি। তান্মপি বহুপ্রকারাণি সম্ভবন্তি
 জাতি-গুণ-ক্রিয়া-দ্রব্যানাং তৎপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং বহুত্বাৎ। তদ যথা—
 ঘটঃ পট ইতি জাতিশব্দঃ। শুক্লো নীল ইতি গুণশব্দঃ। পাচকঃ পাঠক ইতি
 ক্রিয়াশব্দঃ। দণ্ডী বিষাণীতি দ্রব্যশব্দঃ। কেচিৎ পুনরেবাং ক্রিয়ৈবৈকা
 প্রবৃত্তিনিমিত্তমিতি ক্রিয়াশব্দত্বমেব সৰ্ব্বেবাং নামপদানামুপগচ্ছন্তি।
 (ব্যক্তিবিবেক, প্রথম বিমর্শ)

(গ) সঙ্কেতিতচ্চতুর্ভেদো জাত্যাতির্জাতিয়েব বা।

(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস)

(ঘ) সঙ্কেতো গৃহ্যতে জাতৌ গুণদ্রব্যক্রিয়ান্স চ।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কারিকা—৪)

করিয়াছেন। তাঁহার মতে সংস্কৃত গ্রহণের
 জয়দেবের মত ক্ষেত্র ছয়টির নাম যথা—(১) জাতি, (২)
 গুণ, (৩) ক্রিয়া (৪) বস্তুযোগ, (৫) সংজ্ঞা এবং (৬) নির্দেশ।
 উদাহরণ সহ উক্ত ছয়টির নাম তিনি দুইটি শ্লোকে প্রদর্শন
 করিয়াছেন (৬)।

জাতি = অনেক ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টি।

গো শব্দ উচ্চারণ করিলে সমগ্র গোজাতিকেই বুঝায়;
 কাজেই, গোশব্দের শক্তি গোত্রে বা গোজাতিতে গৃহীত
 হইল।

গুণ—গুরু, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ শাদা কাল প্রভৃতি বর্ণকে
 বুঝায়। যদিও দুষ্কৃত গুরুত্ব কর্পূরগত গুরুত্ব বস্ত্রগত গুরুত্ব
 প্রভৃতি ভেদে গুরুগুণের অনেকত্ব কল্পনা করিয়া ইহাকেও
 জাতিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে; তথাপি, একই প্রকারের
 গুরু বা কৃষ্ণগুণের প্রতীতির সময়ে জাতিরূপে তাহার গ্রহণ
 হয় না দেখিয়া সুধীগণ গুণে শক্তিগ্রহ স্বীকার করিয়া
 থাকেন।

ক্রিয়া—পাক, গমন, ক্রীড়া প্রভৃতি শব্দে কোন জাতি

(৬) জাত্যা গুণেন ক্রিয়া বস্তুযোগেন সংজ্ঞয়া।

নির্দেশেন চ মন্তস্তে বড়্‌বিধামভিধাং বুধাঃ ॥

গৌঃ গুরুঃ পাচকো দণ্ডী ডিথঃ কংস ইতি ক্রমাৎ।

কংসং হিনন্তি কংসারিনরং কং চ সমাপ্রিতম্ ॥

(চন্দ্রালোক, দশম ময়ুখ, কারিকা—২-৩)

অথবা গুণ বুঝায় না ; অথচ, ইহাদেরও অর্থ আছে। এই সকল পদদ্বারা এক একটি ক্রিয়া বুঝায় দেখিয়া মনীষিগণ ক্রিয়াতেও সংকেত গৃহীত হয় বলিয়া স্বীকার করেন।

দ্রব্য—এক একটি ব্যক্তি বা বস্তুকে দ্রব্য বলে। রাম, শ্রাম, কলিকাতা, দিল্লী, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দ এক একটি ব্যক্তি, স্থান বা বস্তুকে বুঝাইতেছে ; এই জন্ত এইগুলি দ্রব্যবাচক শব্দ। আলোচ্যস্থলে এই সকল শব্দের একত্ব-বোধক ধর্ম্মকেই দ্রব্যশব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহাদের সংকেত দ্রব্যেই, অর্থাৎ ইহাদের একত্ববোধক ধর্ম্মেই গৃহীত হয় (চ)।

প্রাচীন আচার্য্যগণের মতে এই চারিটিই শক্তিগ্রহের ক্ষেত্র। জয়দেবও এই চারিটিকে স্বীকার করিয়াছেন ; তবে তিনি দ্রব্যশব্দের পরিবর্তে সংজ্ঞাশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন— এই মাত্র বিশেষ।

এই সংজ্ঞা শব্দই ভাস্কর, মন্মট প্রভৃতির গ্রন্থে যদৃচ্ছা-শব্দরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ভাস্কর যে যদৃচ্ছাশব্দ নামে শব্দের প্রকারভেদ স্বীকার করেন না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্মট ভট্টের লেখা দেখিয়া সংজ্ঞা, দ্রব্য ও যদৃচ্ছাশব্দ মনে হয়, তিনি দ্রব্য অর্থেই যদৃচ্ছাশব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা যে সংজ্ঞাস্বরূপ, তাহাও তিনি

(চ) এষেব হি ব্যক্তৈকপাদিষু সংকেতো গৃহ্যতে, ন ব্যক্তৌ ; আনন্ত্যব্যভিচারদোষাপাতাৎ। (সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

বলিয়াছেন (ছ)

জয়দেব 'ডিথ' শব্দটিকে সংজ্ঞার উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, আর বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ ইহাকে দেখাইয়াছেন দ্রব্যের উদাহরণরূপে (জ); সুতরাং জয়দেবের স্বীকৃত সংজ্ঞা যে উপরোক্ত দ্রব্যেরই নামান্তর, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। চন্দ্রালোকের টীকাকার গাগাভট্ট সংজ্ঞাশব্দের স্থলে যদৃচ্ছাশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (ঝ), আর কাব্যপ্রকাশকার 'বক্তৃযদৃচ্ছাসম্মিবেশিত' কথাটিদ্বারা দ্রব্যকে বুঝাইয়াছেন; সংজ্ঞা ও দ্রব্য যে অভিন্ন ইহাও তাহার আর একটি প্রমাণ। 'বক্তৃযদৃচ্ছাসম্মিবেশিত' শব্দের ব্যাখ্যায় আদর্শ-টীকাকার মহেশ্বর শ্রীয়ালালঙ্কার এবং কাব্যপ্রদীপকার শ্রীগোবিন্দ এই কথাটিকেই আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। (ঞ)।

(ছ) ডিথানিষদানামন্ত্যবুদ্ধিনিগ্রাহং সংস্কৃতক্রমং স্বরূপং বক্তৃ।
যদৃচ্ছয়া ডিথাদিষথেষুপাধিষ্মেন সম্মিবেশ্যত ইতি সোহয়ং সংজ্ঞারূপে
যদৃচ্ছাত্মক ইতি। (কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস)

(জ) দ্রব্যশব্দা একব্যক্তিব্যচিনো হরি-হর-ডিথ-ভবিষ্যদয়ঃ।

(সাহিত্যদর্পণ)

(ঝ) অয়মশয়ঃ—যদ্বিধঃ শব্দঃ, জাতিশব্দো গুণশব্দঃ ক্রিয়াশব্দো
যদৃচ্ছাশব্দো বস্তুশব্দো নির্দেশশব্দ ইতি।

(ঞ) স্বারসিকী ইচ্ছা যদৃচ্ছা। তয়া সম্মিবেশিতঃ অবাস্তবোহপি
পুত্রাদৌ নামরূপঃ। (আদর্শ টীকা)

বক্তৃ যদৃচ্ছয়া সম্মিবেশিতো নামরূপঃ। (কাব্যপ্রদীপ)

বস্তুযোগ—বস্তুশব্দের অর্থ জিনিষ। কখন কখন কোন জিনিষের যোগ হেতুও পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে বলিয়া জয়দেব মনে করেন। দণ্ডীশব্দে দণ্ডধারী পুরুষকে বুঝায়। দণ্ডনামক জিনিষটি পুরুষবিশেষের হাতে থাকিয়া অন্যান্য পুরুষ হইতে তাহাকে পৃথগ্ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। জয়দেবের মতে দণ্ডীশব্দের উচ্চারণে দণ্ডের সহিত পুরুষের যে সংযোগরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাতেই সঙ্কেত গৃহীত হয়। অন্যান্যগুলি হইতে ইহার পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য টীকাকার গাগাভট্ট লিখিয়াছেন যে, পাচক প্রভৃতি পদে পাক প্রভৃতি ক্রিয়ার বিশেষণরূপে প্রতীতি হয়, কিন্তু দণ্ডী প্রভৃতি পদে বিশেষণ-রূপে প্রতীতি হয়—দণ্ডসম্বন্ধ প্রভৃতির (ট)।

মহিমভট্ট যে অব্যয়র উদাহরণরূপে দণ্ডী প্রভৃতি পদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

নির্দেশ—‘কৃষ্ণ কাহাকে বধ করিয়াছিলেন?’—এই প্রশ্নের উত্তরে এক ব্যক্তি বলিল—‘যাহার নামে অনুস্মারযুক্ত ক এবং স আছে।’ এই সাঙ্কেতিক নির্দেশদ্বারা ‘কংস’ শব্দটি পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং জয়দেবের মতে, এই স্থলে নির্দেশেই সঙ্কেত গৃহীত হইল।

মহর্ষি পতঞ্জলি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন আচার্য্য-

(ট) পাচকাদিপদে পাকশ বিশেষণে ভানাতিহ দণ্ডসম্বন্ধ বিশেষণে ভানাৎ ভেদঃ। (রাকাগম)

গণের প্রায় সকলেই ডিথ শব্দটিকে দ্রবোর উদাহরণরূপে
 প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধারণতঃ কাষ্ঠময়
 ডিথ ও ডবিথ শব্দ হস্তীকে ডিথ বলে (ডিথঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী);
 তাহা ছাড়া ডিথশব্দের আর একটি পারিভাষিক অর্থ আছে;
 যথা—

“শ্যামরূপো যুবা বিদ্বান্ সুন্দরঃ প্রিয়-ভাষকঃ

সর্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ডিথ ইত্যভিধীয়তে ॥”

বস্তুতঃ ডিথশব্দে সকল কাষ্ঠময় হস্তী বা শ্যামরূপাদিলক্ষণ-
 বিশিষ্ট সকল যুবােকেই বুঝায়; অতএব ইহার শক্তি দ্রব্য
 অথবা সংজ্ঞাতে না বলিয়া জ্ঞাতিতে বলাই অধিকতর যুক্তি-
 যুক্ত মনে হয়। ডবিথশব্দেও সকল কাষ্ঠনির্মিত মৃগকেই
 বুঝায় (ডবিথস্তম্নায়ো মৃগঃ) ; সুতরাং ইহাকেও জ্ঞাতির
 উদাহরণ বলাই যুক্তিসঙ্গত।

দণ্ডীশব্দে সকল দণ্ডধারী পুরুষকেই বুঝায়; অতএব এই
 শব্দটিও বস্তুতঃ জ্ঞাতির উদাহরণ হওয়াই
 দণ্ডী ও কংস শব্দ উচিত বলিয়া আমি মনে করি।

যাহার নামে অনুস্মারযুক্ত ক এবং স আছে—এই
 বাক্যটিও বিবরণ মাত্র। বিবরণের সাহায্যে কংসশব্দটি
 পাওয়া যাইতেছে, এবং কংস শব্দ একটি ব্যক্তির বোধক;
 কাজেই, এই ক্ষেত্রে দ্রব্যে শক্তিগ্রহ হইয়াছে বলাই আমার
 বিবেচনায় অধিকতর সঙ্গত।

প্রাচীন আচার্য্যগণ জ্ঞাতি প্রভৃতিভেদে সঙ্কেতগ্রহণের

যে চারিটি ক্ষেত্র-প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের নাম
দিয়াছেন—উপাধি। উপাধিশব্দের অর্থ—বস্তুগত ধর্ম।

সঙ্কেতিতার্থ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত কোন মানুষের অন্তরে
স্বভাবতঃই প্রশ্ন জন্মিতে পারে—সঙ্কেত কোথায় গৃহীত হয়,
বস্তুতে না তাহার ধর্মে। আচার্য্যগণ বলেন—বস্তুর ধর্মেই

সঙ্কেত গৃহীত হয়, বস্তুতে নহে। এই বস্তুধর্মই

উপাধি

উপাধি। বস্তু অনেক, কিন্তু তাহাদের ধর্ম

একই থাকে। এই কারণে, প্রতি বস্তুতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
সঙ্কেত গ্রহণ করিতে হইলে অনবস্থা। দোষ ঘটে, অর্থাৎ বস্তু
অনন্ত বলিয়া সঙ্কেতও অনন্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু বস্তুর ধর্মে
সঙ্কেত গ্রহণ করিলে আর এই দোষ হয় না।

আচার্য্য মন্মট তাঁহার কাব্য-প্রকাশ নামক গ্রন্থে উপাধির
চারিটি বিভাগ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন,

উপাধিকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়

উপাধির বিভাগ

—(১) বক্তৃষদৃচ্ছাসন্নিবেশিতধর্ম, এবং

(২) বস্তুধর্ম।

বক্তা নিজের ইচ্ছানুসারে যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা
বস্তুকে বুঝাইবার জন্য শব্দ উচ্চারণ করেন, তখন শ্রোতারও
তাঁহার উচ্চারিত সেই শব্দদ্বারা তাঁহারই অভিপ্রেত ব্যক্তি
বা বস্তুটিকে বুঝিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে বক্তার অভিপ্রেত
ব্যক্তি বা বস্তুটিতে যে অন্ত্যাব্যবর্তক ধর্ম আছে, তাহাতেই
সঙ্কেত গৃহীত হয়; এই কারণে ইহাকে 'বক্তৃষদৃচ্ছা-

সন্নিবেশিত-ধর্ম' বলে। ইহারই নাম দ্রব্য বা সংজ্ঞা।

বস্তুধর্ম আবার দুইভাগে বিভক্ত—(১) সাধ্য, এবং (২) সিদ্ধ। এমন অনেক শব্দ আছে, যাহারা ধাতুর সহিত ত্রি-প্রভৃতি প্রত্যয়ের যোগে উচ্চারিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে। কখন কখন ইহার কুৎপ্রত্যয়যোগেও অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে সাধিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে সাধ্য বলা হয়। ইহাদের এই সাধ্য্য অন্ত-ব্যাবর্তক ধর্ম এবং এই ধর্মেই ইহাদের সংস্কৃত গৃহীত হইয়া থাকে। এই সাধ্যেরই অপর নাম ক্রিয়া।

সিদ্ধ নামক বস্তুধর্মও আবার দুইভাগে বিভক্ত—(১) পদার্থের প্রাণপ্রদ, এবং (২) বিশেষাধানহেতু। যখন কোন বিশিষ্ট একটিমাত্র বস্তুকে বুঝাইবার জন্য শব্দ উচ্চারণ করা হয় না, কিন্তু একই প্রকারের অনেকগুলিকে বুঝাইবার জন্য শব্দ উচ্চারিত হয়, তখন অনেকের মধ্যে একত্বের কল্পনা রূপে যে পরমাত্মগুণের গ্রহণ হয়, তাহারই ফলে শব্দবোধ্য হইয়া থাকে; এই কারণে চিন্তানায়কগণ ইহাকে পদার্থো-প্রাণপ্রদ বলিয়াছেন (৪)।

(৪) গিদ্ধোহপি দ্বিবিধঃ—পদার্থস্ত প্রাণপ্রদো বিশেষাধানহেতুস্তত্রাত্মো জাতিঃ। (কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস)

প্রাণপ্রদো জাতিঃ। (কাব্যপ্রদীপ)

প্রাণপ্রদত্বঞ্চ যাবৎস্থিতিসম্বন্ধিত্বম্। (কাব্যপ্রকাশটিপ্পনী)
এতদ্ব্যক্তিবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব জাতিরিত্তি ভাবঃ।

(বৈয়াকরণভূষণসার, ৭৩ তম কারিকার ব্যাখ্যা)

অন্য পদার্থ হইতে কোন বিশেষ পদার্থকে পৃথকভাবে গ্রহণ করিবার জন্য সেই পদার্থে স্থিত বিশেষ গুণের স্বরণে অনেক সময় শব্দার্থ নিরূপিত হয়। 'কাল গাভীটিকে লইয়া আস' বলিলে সাদা লাল প্রভৃতি অন্যান্য গাভীর মধ্য হইতে বাছিয়া কাল রংএর গাভীটিকে আনয়ন করা হয়। তাহার কাল বর্ণই এই ক্ষেত্রে অন্য-ব্যাবর্তক হইয়া অভীষ্ট বস্তুর পরিচায়ক হইল। ইহাকেই 'বিশেষাধানহেতু' বলা হয়। ইহার অন্য নাম—গুণ।

মীমাংসকেরা উপাধির এই চারিটি বিভাগ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—সংজ্ঞা বা দ্রব্যে সংকেত গৃহীত হয় না। ডিথ, দেবদন্ত, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিলে যখন ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের জ্ঞান হয়, তখনও জাতিতেই সংকেত গৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহাদের মতে, সংকেত ডিথ প্রভৃতি দ্রব্যে না হইয়া ডিথত্ব, দেবদন্তত্ব, চন্দ্রত্ব, সূর্যত্ব প্রভৃতি জাতিতেই হয়। এইভাবে তাঁহারা গুণ বা ক্রিয়াতেও সংকেত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, সংকেত শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি গুণে বা পাক, গমন প্রভৃতি ক্রিয়াতে না হইয়া ইহাদের জাতিতেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ, মীমাংসকমতে শ্বেতত্ব, কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি গুণজাতিতে এবং পাকত্ব, গমনত্ব প্রভৃতি ক্রিয়াজাতিতে সংকেত গৃহীত হয়। এইভাবে মীমাংসকগণ কেবলমাত্র জাতিতেই

সঙ্কেত স্বীকার করিয়া থাকেন (ড)।

দেবদত্ত, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি ব্যক্তি বা বস্তু এক একটিকে দেখা যায়, অথচ অনেকের না থাকিলে জাতি হয় না, এমতাবস্থায় দেবদত্ত প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে জাতিতে সঙ্কেত স্বীকার করিব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন—দেবদত্ত এক হইলেও বাল্য-কৈশোরাদি অবস্থাভেদে

(ড) হিম-পয়ঃ-শব্দাণ্যশ্রেণ্যেব পরমার্থতো ভিন্নেষু শুক্লাদিবু বদ্বশে শুক্লঃ শুক্ল ইত্যাত্তভিন্নাভিধানপ্রত্যয়োংপত্তিস্তচ্ছব্বাদিসামান্যম্, শুক্লতণ্ডুলাদিপাকাদিশ্বেবমেব পাকাদিত্বম্, বালবৃদ্ধশুকাভ্যাদৌরিজে ডিখাদিশব্দেষু চ প্রতিক্ষণং ভিন্নমানেষু ডিখাত্তর্থেষু বা ডিখত্বাত্তস্মৈ সর্ব্বেষাং শব্দানাং জাতিরেব প্রবৃত্তিনিমিত্তমিত্যন্তে।

(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস।)

The Mimamsakas hold that there is a জাতি of গুণ such as শুক্লত্ব (there being something in all white substances such as snow, milk etc, by virtue of which they are called white), a জাতি of ক্রিয়া such as পাকত্ব (in the cooking of diverse things such as molasses, rice etc), a জাতি of সংজ্ঞার্থ (i. e, দ্রব্য to which the সংজ্ঞা appertains) such as ডিখত্ব (in the object named ডিখ undergoing change at every moment); and as such সঙ্কেত is to be placed on জাতি alone and not on জাতি, গুণ, ক্রিয়া and দ্রব্য।

(“A short Analysis of the contents of the Kavyaprakasa” by Dr. Amareswar Thakur M-A. Ph. D. chapter—II)

তাহাতেও অনেকই আছে, এবং এই অনেকই আশ্রয় করিয়াই তাহাকে আমরা জাতিরূপে স্বীকার করি। তাহা ছাড়া দেবদত্ত নামে বিভিন্ন ব্যক্তিও দেখা যায়; অতএব, দেবদত্ত শব্দ অনেক ব্যক্তির বাচক বলিয়াই বা স্বীকৃত হইবে না কেন? চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দেও মীমাংসকগণ প্রাতঃ-কালীনত্বাদি অবস্থাভেদ অঙ্গীকার করিয়া অনেকরূপ-জাতি স্বীকার করিয়া থাকেন (দেবদত্তঃ চন্দ্রঃ সূর্য্যঃমিত্যবস্থা-ভেদাৎ)। হৃগ্নগত গুরুত্ব, চন্দ্রিকাগত গুরুত্ব, কর্পূরগত গুরুত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্যের গুরুত্বাদি গুণকে পৃথগ্ভাবে গ্রহণ করিয়া গুণে, এবং অগ্নের পাক, ব্যঞ্জনের পাক, রুটির পাক প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্যে বিভিন্ন পাকক্রিয়া কল্পনা করিয়া ক্রিয়া-তেও তাঁহারা পাকত্ব প্রভৃতি জাতি স্বীকার করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ, মীমাংসকগণের এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সকল শব্দেই যদি এইরূপ 'কাল্পনিক' অনেকই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে একত্বের আশ্রয় বলিয়া কিছুই থাকিবে না; এবং একত্ব না থাকিলে ব্যক্তি

বলিয়া কিছুই স্বীকার করা চলিবে না।

মীমাংসক-মতের খণ্ডন

যদি ব্যক্তির অস্তিত্ব না থাকে, তবে

'অনেকব্যক্ত্যাধারা হি জাতিঃ' এই জাতিলক্ষণ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে; অর্থাৎ, সর্বত্রই অনেকই স্বীকৃত হওয়ায় একত্বের অভাবে জাতিসংজ্ঞাই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সম্ভবতঃ, এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ

উপাধির চারিটি বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন।

বৌদ্ধাচার্য্যগণ শব্দের শক্তিগ্রহণের ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে, শব্দের শক্তিগ্রহ হয় অপোহে; জ্ঞাতি প্রভৃতিতে নহে। অপোহ শব্দের অর্থ

অপোহবাদ ‘অতদ্ব্যাবৃতি’। তাঁহাদের মতে, গোশব্দ

উচ্চারণ করিলে অশ্ব প্রভৃতি অশ্ব-পদার্থের ব্যাবৃতিমুখেই গো-পদার্থের জ্ঞান হয়। এই অশ্বব্যাবৃত্তিকেই তাঁহারা গো-শব্দের অর্থ মনে করেন।

বৌদ্ধাচার্য্যগণের এই অপোহবাদ-স্বীকৃতির পশ্চাতে যে হেতু আছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যিক। বৌদ্ধগণ ক্রণিকত্ববাদী; অতএব তাঁহারা কোন বস্তুতে শব্দের শক্তিগ্রহ স্বীকার করিতে পারেন না। বস্তুমাত্রেরই ত্রিষ্ফণ বা ততোধিককাল স্থায়ী বলিয়া বস্তুতে শক্তিগ্রহ স্বীকার করিলে ক্রণিকত্ববাদ ভঙ্গ হয়। এই কারণে নিজেদের স্বীকৃত ক্রণিকত্ববাদ রক্ষা করিবার জন্য বৌদ্ধাচার্য্যগণকে অবস্তুতে শক্তিগ্রহ স্বীকার করিতে হইয়াছে। অপোহ বস্তু নহে; অতএব, তাহার ত্রিষ্ফণ-স্থায়িত্বও নাই। বৌদ্ধাচার্য্যগণ এই কারণেই অপোহে শক্তিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন।

উদ্যোতকার * প্রভৃতি কেহ কেহ এই অপোহবাদের

* কেহ কেহ ইহাকে উদ্যোতকর, কেহ বা উদ্যোতকর রূপে পাঠ করিয়া থাকেন। আমরা কলিকাতা National Library স্থিত গ্রন্থে যেরূপ পাঠ দেখিয়াছি, তাহাই গ্রহণ করিলাম।

উপর दोषारोप करिते गिया युक्ति देखाईयाছেন যে, অতদ্ব্যাবৃতি এবং তদর্থ এক কথা নহে; অতএব যদি অপোহেই শব্দের শক্তিগ্রহ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পৃথগ্ভাবে শব্দের স্বার্থও প্রদর্শন করা আবশ্যিক (চ)।

বৌদ্ধাচার্য্য শাস্তুরক্তি তাঁহার 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে উত্তোতকারের প্রদর্শিত উল্লিখিত আপত্তিটির খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের (বৌদ্ধাচার্য্যগণের) মতে এই অতদ্ব্যাবৃতিরূপ অপোহই শব্দার্থ (ণ)।

অপোহ-সংজ্ঞার কারণ সম্বন্ধে চারিটি হেতু প্রদর্শন করিয়া শাস্তুরক্তি বলিয়াছেন যে, উক্ত চারিটির মধ্যে একটি মুখ্য এবং অবশিষ্ট তিনটি গৌণ (ঔপচারিক)। তাঁহার মতে 'অপোহত ইত্যপোহঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অতদ্ব্যাবৃতিই (তদিতরব্যাবৃতি) অপোহ শব্দের মুখ্যার্থ। 'প্রতিভাসান্তরাস্তেদাং ...' (কারিকা—১০০৭) ইত্যাদি তত্ত্বসংগ্রহ-কারিকার ব্যাখ্যায় টীকাকার কমলশীল স্পষ্টই

(চ) আচার্য্য-দিগ্‌নাগস্তোপরি যদুত্তোতকারেণোক্তম্—যদি শব্দশ্রাপোহোহভিধেয়োহর্থস্তদাভিধেয়ার্থব্যতিরেকেণাস্ত স্বার্থে বক্তব্যঃ।
(কমলশীলকৃত পঞ্জিকা)

(ণ) অর্থান্তরব্যবচ্ছেদঃ কুর্ষতী শ্রুতিরূচ্যতে।

অভিধত্ত ইতি স্বার্থমিত্যেতদবিরোধি তৎ ॥

(তত্ত্বসংগ্রহ, কারিকা—১০১৬)

এই কথা জানাইয়াছেন (ত)।

শাস্তুরক্ষিত যে এই মুখ্যার্থেই অপোহ শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও তত্ত্বসংগ্রহের ১০০৯ সংখ্যক কারিকা হইতে জানা যায় (খ)। উক্ত কারিকার ব্যাখ্যায় কমলশীল কারিকাকারের অভিপ্রায় স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছেন (দ)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অন্তব্যাবৃত্তি বা অপরার্থের নিষেধই অপোহ শব্দের বৌদ্ধাচার্য্যসম্মত অর্থ। এই নিষেধরূপ অপোহকে বৌদ্ধাচার্য্যগণ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, পর্য্য্যদাস ও প্রসহ ভেদে অপোহ দুই প্রকার। তন্মধ্যে পর্য্য্যদাস

(ত) চতুর্ভির্নিমিত্তৈরপোহ ইতি তস্মাখ্যা। বিকল্পান্তরারোপিত-প্রতিভাসান্তরাদ্ ভেদেন স্বয়ং প্রতিভাসনাস্মুখ্যাতঃ। অপোহত ইত্যপোহোহন্তস্মাদপোহোহন্তাপোহ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। উপচারাত্ত্রিভিঃ। (পঙ্খিকা)

(খ) তত্রান্তাপোহ ইত্যোষা সংজ্ঞোক্তা সনিবন্ধনা।

স্বলক্ষণেহপি তদ্ব্যবহাবিশ্লেষভাবতঃ ॥

(তত্ত্বসংগ্রহ, কারিকা—১০০৯)

(দ) অন্তাপোহ ইত্যোষা সংজ্ঞোক্তা। সনিবন্ধনেতি প্রকৃতেন সম্বন্ধঃ। তত্র নিবন্ধনমাহ অন্তবিশ্লেষভাবত ইতি। অন্তস্মাদ্ বিজ্ঞাতীয়াৎ বিশ্লেষো ব্যাবৃত্তিস্তস্য ভাবাৎ। বিজ্ঞাতীয়-বিশ্লেষস্ত বিজ্ঞানত্বাদিত্যিহাৎ। এতেন মুখ্যত এব স্বলক্ষণেহন্তাপোহব্যাপদেশ ইত্যুক্তঃ ভবতি।

(পঙ্খিকা)

আবার বুদ্ধাঙ্গা ও অর্থ্যাঙ্গাভেদে দ্বিবিধ (খ)।

বস্তুতঃ, বৌদ্ধাচার্য্যগণের এই মতটি অনুভব-বিরুদ্ধ। অপোহবাদিগণের মতে 'ইহা গরু' বলিলে 'ইহা গরু ভিন্ন অশ্ব কিছু নহে' এই প্রকার জ্ঞান জন্মে; কিন্তু আমাদের অনুভব সাক্ষ্য দিতেছে যে, উল্লিখিত গরুশব্দের উচ্চারণ শ্রোতার মনে শৃঙ্গলাঙ্গুলাদি-বিশিষ্ট গরু নামক জন্তুটিরই জ্ঞান জন্মাইয়া দিতেছে। গরুশব্দের অর্থপ্রতীতির সময়ে 'গরু ভিন্ন অশ্ব কিছু নহে' ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে বলিয়া আমরা অনুভব করি না। যদি এইস্থলে তাদৃশ জ্ঞান জন্মে বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, 'ইহা অশ্ব নহে,' 'ইহা গর্দভ নহে' এই আকারে একে একে জগতের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞানের অপোহ হওয়ার পর গোশব্দের অর্থ প্রতীত হয়; কিন্তু, এইরূপ কল্পনা অর্যোক্তিক এবং অনুভব-বিরুদ্ধ। উল্লিখিতস্থলে সমূহালম্বনান্বকরূপে অপোহের প্রতীতির কল্পনাও অনুভববিরুদ্ধ।

অশ্বদিক্ দিয়া বিচার করিলেও অপোহবাদ স্বীকার করা চলে না। অপোহেই যদি শব্দের শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, 'ইহা অশ্ব নহে' কথাটির অর্থ 'ইহা হস্তী'; কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত

(খ) তথাহি দ্বিবিধোহপোহঃ পৰ্য্যদাস-নিষেধতঃ।

দ্বিবিধঃ পৰ্য্যদাসোহপি বুদ্ধাঙ্গার্থ্যাঙ্গভেদতঃ ॥

(তত্ত্বসংগ্রহ, কারিকা—১০০৪)

হইতে পারে না। 'ইহা অশ্ব নহে' বলিলে অশ্বসম্বন্ধীয় জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু ইহা দ্বারাই প্রকৃত বস্তুর জ্ঞান জন্মে না। প্রকৃত বস্তুর প্রতিপাদনের জন্য অপর কোন অপোহব্যতিরিক্ত শব্দের উচ্চারণ আবশ্যিক হয়, এবং সেই শব্দই উক্ত বস্তুটির প্রতিপাদন করে। অতএব শব্দের শক্তিগ্রহ অপোহে হয় না। অপোহে যখন শক্তিগ্রহই হয় না, তখন তাহার অবাস্তুর-বিভাগ-সম্বন্ধে আলোচনাও অনাবশ্যক।

মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সংযোগাদি-
সম্বন্ধে আলোচনা মনে করেন--সংযোগ, বিয়োগ প্রভৃতি কেবলমাত্র ব্যঞ্জনারুত্তিরই সহায়ক; অভিধাবৃত্তিস্থলে ইহাদের কোন উপযোগিতা নাই। তাঁহাদের এই মত আমি মানিয়া লইতে পারি না।

যখন অভিধাবৃত্তি অর্থপ্রকাশ করিতে অক্ষম হয়, তখনই লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা-বৃত্তির প্রবেশ হইয়া থাকে। অভিধা দ্বারা অর্থবোধ হইলে আর লক্ষণা বা ব্যঞ্জনার প্রবেশ ঘটে না।

ব্যঞ্জনারুত্তির স্থল নির্দেশ করিতে গিয়া আচার্য্যেরা পরিষ্কার বলিয়াছেন—যে স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের চেয়ে প্রধান, সেই স্থলে ধ্বনি, এবং যে স্থলে প্রধান নহে, সেই স্থলে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে। গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের আবার

দুইটি স্তর আছে—(১) যখন বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থের চেয়ে প্রধান হয়, এবং (২) যখন বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ উভয়েরই সমান প্রাধান্য থাকে (ন)।

গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য স্থলে কোন না কোন অর্থালঙ্কার অথবা রসালঙ্কার হইয়া থাকে ; সুতরাং আমরা বলিতে পারি—যে বাক্যে ধ্বনি অথবা অলঙ্কার নাই, তাহাতে ব্যঙ্গ্যার্থও নাই। ব্যঙ্গ্যার্থ না থাকিলে ব্যঙ্গনাবৃত্তিও স্বীকার করা যায় না। অতএব, যে বাক্যে ধ্বনি বা অলঙ্কার নাই, অথচ সংযোগাদি অর্থ-নির্ণয়ে সহায়তা করিতেছে, সেই স্থলে সংযোগাদি অভিধাবৃত্তিরই সহায়ক হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

নানার্থশব্দ-স্থলে যখন সংযোগাদির
জগন্নাথ পণ্ডিতের
মত
সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট অর্থের প্রতীতি হয়,
তখন কেবলমাত্র ব্যঙ্গনাবৃত্তিই অর্থবোধ
জন্মায়, না অন্য বৃত্তিও অর্থবোধ জন্মাইতে পারে—এই
সম্বন্ধে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁহার 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থের
দ্বিতীয় আননে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত

(ন) অপরন্ত গুণীভূতব্যঙ্গ্য বাচ্যাদমুত্তমে ব্যঙ্গ্যে।

(সাহিত্যদর্পণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ,

কারিকা—১৩)

অমুত্তমত্বং নূনতয়া সামোন চ সম্ভবতি।

(ঐ, ব্যাখ্যা।)

করিয়াছেন যে, ঐরূপ স্থলে শক্তি বা অভিধাও অর্থবোধ জন্মাইতে পারে (প)।

পণ্ডিতরাজের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, সংযোগাদিসহায়ে নানার্থশব্দের নির্দিষ্টার্থ-প্রতিপাদনে ব্যঞ্জনা কারণ নহে, অভিধাই কারণ। অবশ্য ঐরূপ স্থলে অর্থের বৈচিত্র্য থাকিলে ব্যঞ্জনার প্রবেশ ঘটবে, এই বিষয়ে তাঁহার আপত্তি নাই। পণ্ডিতরাজ সংযোগাদির যে সকল উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের সকলটিই অভিধার উদাহরণ নহে; বস্তুতঃ উহাদের অনেকটিতেই ব্যঞ্জনার প্রবেশ ঘটিয়াছে। মন্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশ এবং বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে সংযোগাদির সাহায্যে অভিধামূল্যব্যঞ্জনার যে সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, একমাত্র ‘অন্যশব্দের সন্নিধি’ ছাড়া বাকী সকলগুলিতেই পণ্ডিতরাজ কোথাও সেই উদাহরণগুলিই এবং কোথাও বা তাহাদের অনুরূপ উদাহরণ

(প) বদপ্যচ্যুতে প্রকরণাদিজ্ঞানাং প্রাকরণিকৈর্হর্থে তাৎপর্য-বিষয়তয়া নির্ণীতে তদীয়-শব্দবোধানন্তরনতাৎপর্যবিষয়ীভূতার্থবোধো জায়মানো ব্যঞ্জনব্যাপারসাধ্য ইতি। তন্ন। কিময়ং নানার্থস্থলে সর্বত্রৈব ব্যঞ্জনোল্লাস আভোস্থিং কচিদেবেতি সন্দেহম্। নাথঃ। প্রাকরণিকাপ্রাকরণিকয়োর্থয়োঃ শব্দবুদ্ধৌ সর্বত্রাত্যুপগম্যানায়াস্তাৎপর্যজ্ঞানকারণতয়াঃ কল্পনস্ত নৈরর্থক্যাপত্তেঃ। ...। নাপি দ্বিতীয়ঃ হেতোরভাবাৎ। ...। ইহৈবং স নিয়ন্ত্রিতশব্দৈরেবোল্লাসকোহুত্তি কৃতং নানার্থস্থলে ব্যক্তিকল্পনয়া। (রসগঙ্গাদ্রব, দ্বিতীয় আনন)

প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সংযোগাদির সাহায্যে অভিধা ও ব্যঞ্জনার পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণ প্রদর্শন করিব।

সংযোগাদি. যথা—সংযোগ, বিয়োগ, সাহচর্য, বিরোধ, অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, অন্তশব্দসন্নিধি, সামর্থ্য, ঐচ্ছিতী, দেশ, কাল, ব্যক্তি, এবং স্বর প্রভৃতি (ফ)।

‘চক্রধারী হরিও এই দেবালয়ে আছেন’—এই বাক্যে কোন ধ্বনি বা অলঙ্কার পাওয়া যাইতেছে না; অথচ চক্রশব্দের সংযোগ হেতু হরিশব্দে বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে;

কাজেই, এই স্থলে সংযোগরূপ হেতুদ্বারা

সংযোগাদি-যোগে

অভিধান উদাহরণ

অভিধেয়ার্থই প্রকাশিত হইল। এই ক্ষেত্রে

আর একটি যুক্তি দেখান যাইতে পারে।

অভিধানদ্বারা কোন শব্দের যে অর্থ নির্ণীত হয়, তাহাকে সেই শব্দের অভিধানভ্যর্থই বলিতে হইবে; অন্যথা কোষের ‘অভিধান’ নামটিই বৃথা হইয়া পড়ে (ব)।

(ফ) সংযোগে। বিপ্রয়োগে সাহচর্য্য বিরোধিতা।

অর্থঃ প্রকরণঃ লিঙ্গঃ শব্দশ্রাণ্ত শন্নিধিঃ ॥

সামর্থ্যমৌচ্ছিতী দেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ।

শব্দার্থজ্ঞানবচ্ছেদে বিশেষশ্রুতিহেতবঃ ॥

(ব) অভিধা হইতে পদের যে অর্থজ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকে

‘অভিধান’ বলে।

[মীমাংসাদর্শন, সুখময়ভট্টাচার্য্যকৃত (বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থ), পৃষ্ঠা—২]

অভিধানে বিষ্ণু অর্থে হরি শব্দের প্রয়োগ আছে (ভ)। অতএব, 'বিষ্ণু' হরিশব্দের অভিধানভ্যর্থ্য নহে—এমন কথা বলিব কি প্রকারে? অভিধানে হরিশব্দের যে কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটিই তাহার অভিধেয় বা অভিধানভ্যর্থ্য। চক্রশব্দের সংযোগ অন্ত্যন্ত অভিধেয়ার্থ নিবৃত্ত করিয়া 'বিষ্ণু' অর্থটি প্রকাশ করিতেছে, এই মাত্র বিশেষ। অতএব, উল্লিখিত স্থলে সংযোগরূপ হেতুদ্বারা অভিধানভ্যর্থ্যেরই গ্রহণ হইল—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যে স্থলে বাক্যে ধ্বনি বা গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের প্রবেশ হইবে, সেই স্থলে সংযোগাদিদ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থও প্রকাশিত হইতে পারে। যথা :—

“হরিঃচন্দ্রশ্চ হস্তে তু দৃষ্ট্বা চক্রং পরিক্ষতম্।

জ্যোতিষিকো মুদাবাদীদ্ ভবাংশচক্রধরো হরিঃ ॥”

এই বাক্যে 'চক্রধর হরি চক্রধর হরির মত' এইরূপ একটি উপমালঙ্কার ব্যক্ত হইতেছে; এবং চক্রের সংযোগই উল্লিখিত ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রকাশে সহায়তা করিতেছে; কাজেই, এই স্থলে সংযোগ ব্যঞ্জনারুত্তির সহায়ক হইল।

এই ভাবে বিয়োগ, সাহচর্য, বিরোধ প্রভৃতিদ্বারা যখন শব্দের অভিধেয়ার্থ মাত্র গৃহীত হয়, এবং বাক্যে ধ্বনি

(ভ) ষমানিলেচন্দ্রাৰ্কবিষ্ণুসিংহাংগবাজিষু।

শুকাহি-কপিভেকেষু হরিনা কপিলে জিষু ॥

(.অমরকোষ, নানার্থবর্গ)

বা গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য প্রবেশ করে না, তখন ঐসকল স্থলেও
বিয়োগাদি অভিধাবৃন্তিরই সহায়ক হইয়াছে বলিয়া
স্বীকার করিতে হইবে।

বিয়োগের দ্বারা অভিধা যথা—‘যুদ্ধকাল ভিন্ন অন্য
সময়ে হরির হাতে বজ্র থাকে না।’ বজ্র ইন্দ্রেরই হাতে
থাকে ; অতএব বজ্রবিয়োগরূপ হেতুদ্বারা হরিশব্দে ইন্দ্রকে
বুঝাইল।

সাহচর্য্যে যথা—‘ভীম ও অর্জুন স্নান করিতে চলিলেন।’
এই স্থলে ভীমশব্দের সাহচর্য্য হেতু অর্জুন শব্দে তৃতীয়
পাণ্ডবকে বুঝাইতেছে।

বিরোধ যথা—‘কর্ণ ও অর্জুন যুদ্ধ করিতেছিলেন।’
এই ক্ষেত্রেও কর্ণের সহিত তৃতীয় পাণ্ডবেরই বিরোধ ছিল
বলিয়া অর্জুন শব্দে তৃতীয় পাণ্ডবকে বুঝাইল।

অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, অশব্দসান্নিধ্য, ঔচিত্য, দেশ
এবং কালের যোগে অভিধার উদাহরণ পূর্বেই প্রদত্ত
হইয়াছে।

সামর্থ্যের যোগে অভিধা, যথা—‘মধুনা মন্তঃ পিকঃ’
(মধুদ্বারা মন্ত কোকিল)। এই স্থলে কোকিলকে মন্ত
করার সামর্থ্য বসন্তকালেরই আছে ; সুতরাং মধুশব্দে
বসন্তকালকে বুঝাইল।

ব্যক্তিশব্দে স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গকে বুঝায়।
রথাস্ত্রশব্দ চক্রবাক অর্থে পুংলিঙ্গ এবং রথের চাকা অর্থে

ক্লীবলিঙ্গ। রথাস্ত্র শব্দের পুংলিঙ্গ অথবা ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ দেখিয়া তাহার উল্লিখিত অর্থদ্বয়ের যে কোন একটি গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাই ব্যক্তিহেতুর উদাহরণ। ‘ভাতি রথাস্ত্র’ বলিলে ক্লীবলিঙ্গে নির্দেশ হেতু রথাস্ত্রশব্দে রথের চাকাকে বুঝায়; আবার ‘ভাতি রথাস্ত্রঃ’ বলিলে পুংলিঙ্গে নির্দেশ হেতু চক্রবাকপক্ষীকে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপে ‘মিত্রো ভাতি’ বলিলে মিত্রশব্দ সূর্য্য-অর্থে এবং ‘মিত্রং ভাতি’ বলিলে বন্ধু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বুঝা যায়।

সামর্থ্য এবং ঔচিতির মধ্যে পার্থক্য এই যে, সামর্থ্য হেতুর উদাহরণ ‘মধুনা মন্তঃ পিকঃ’ প্রভৃতি স্থলে মন্ততা উৎপাদনের অনুকূল করণতা মধু (বসন্ত) প্রভৃতিতে থাকা

সামর্থ্য ও ঔচিতির
পার্থক্য

আবশ্যক (ম); কিন্তু ঔচিতিহেতুস্থলে তাদৃশ করণতা থাকার প্রয়োজন নাই। ঔচিতির উদাহরণ ‘তরকারীতে সৈন্ধব দিবে’ স্থলে সৈন্ধবের তরকারীতে প্রযুক্ত হওয়ার যোগ্যতামাত্র থাকা আবশ্যক।

এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, শব্দার্থনির্ণয়ের হেতুরূপে পূর্ব্বে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে (বুদ্ধব্যবহার, প্রসিদ্ধ-পদের সন্নিধ্য ও আশ্রয়পদেশ), তাহার অতিরিক্ত সংযোগ প্রভৃতি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, ঔচিত্য, দেশ, কাল প্রভৃতি

(ম) সামর্থ্য করণতা। (বসন্তঋতুর)

যে পূর্বোক্ত বুদ্ধব্যবহারাদি হেতুব্রয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত, পূর্বোই তাহা দেখান হইয়াছে। সংযোগ, বিয়োগ, সাহচর্য্য এবং বিরোধ—এই চারিটিও বস্তুতঃ ‘অন্যশব্দের সান্নিধ্য’-রূপ হেতুর অন্তর্গত। সামর্থ্য-হেতুর উদাহরণ ‘মধুনা মত্তঃ পিকঃ’ স্থলেও অন্যশব্দের সান্নিধ্যহেতুই মধুশব্দে বসন্তকালকে বুঝাইতেছে। ব্যক্তি-হেতুর উদাহরণ ‘ভাতি রথাস্তম্’ প্রভৃতি স্থলে ক্রীবলিঙ্গে প্রয়োগ হেতু রথাস্তম্‌শব্দে যে রথের চাকাকে বুঝাইল এবং পুংলিঙ্গে প্রয়োগ হইলে এই একই শব্দ চক্রবাক পক্ষীকে বুঝায়, তাহাও বস্তুতঃ অভিধান হইতে জানা যায়। অভিধান আপ্তবাক্যেরই স্বরূপবিশেষ। অতএব, ব্যক্তিহেতুও আপ্তবাক্যেরই অন্তর্গত। এইভাবে সংযোগাদি সকল হেতুই যখন পূর্বোক্ত তিনটি হেতুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, তখন আর তাহাদিগকে পৃথগ্ভাবে বিচার করিব কেন? —এই প্রশ্ন অসঙ্গত নহে।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্যঞ্জনাবৃত্তি-নির্ণয়ের ব্যাপারে আচার্য্যগণ সকলেই এই হেতুগুলিকে স্বীকার করিয়াছেন। যদি এইগুলিকে স্বীকার না করিতে হয়, তবে কোন স্থলেই স্বীকার না করা উচিত। ব্যঞ্জনাবৃত্তিস্থলে স্বীকার করিব, কিন্তু অভিধাবৃত্তিস্থলে স্বীকার করিব না—এ কেমন কথা?

বস্তুতঃ, সংক্ষেপে বিচার করিতে গেলে প্রথমোক্ত ৩টি (বুদ্ধব্যবহার প্রভৃতি) হেতুর মধ্যেই বাকীগুলি অনুপ্রবিষ্ট হয় দেখিয়া এই তিনটিই গণনা করা হইয়াছে। তারপর

বিস্তৃতভাবে বিচার করিতে গেলে উক্ত তিনটি হেতুৰ মধ্যে যে সকল অবাস্তুর বিভাগ আছে, তাহাদিগকেও গণন করা হইল—এইমাত্র বিশেষ।

‘স্বরাদয়ঃ’ এই পদের অন্তর্গত আদিশব্দদ্বারা কারিকাকার অঙ্গুলিসঙ্কেত প্রভৃতিকেও শব্দার্থনির্ণয়ের হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি ‘ইহা দেখ’ বলিয়া অঙ্গুলিনির্দেশে কোন বস্তু দেখাইয়া দিলে, পার্শ্বস্থ ব্যক্তি তাহার নির্দেশিত বস্তুর দিকে তাকাইয়া সেই বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করে। এই স্থলে বাক্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য না থাকায় অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা অভিধাণভ্যর্থেরই গ্রহণ হইল। কিন্তু যখন ‘এতাবন্মাত্রস্তনী’ বলিয়া হস্তদ্বারা স্তনের পরিমাণ দেখান হয়, তখন তাহাতে স্তনের আকৃতিসম্বন্ধীয় জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা আদিরসের জ্ঞানও জন্মিয়া থাকে। এবংবিধ বাক্যে বৈচিত্র্য থাকায় হস্তসঙ্কেতদ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থই প্রকাশিত হয়।

মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে কাব্যে স্বরের কোন উপযোগিতা নাই। তাহাদের মতে কেবলমাত্র বেদেই স্বরের উপযোগিতা সীমাবদ্ধ (য)।

(য) ইন্দ্রশক্ররিত্যাদৌ বেদ এব ন কাব্যে স্বরো বিশেষপ্রতীতিকৃৎ।

(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস)

স্বরন্ত বেদ এব বিশেষপ্রতীতিকৃৎ কাব্য ইতি তস্ম বিষয়ো নোদাহৃতঃ। (সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

যাঁহারা কাব্যেও স্বরের উপযোগিতা স্বীকার করেন, আচার্য্য বিশ্বনাথ তাঁহাদের মতও সাহিত্য-দর্পণে উল্লেখ করিয়া উঠা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি-রসবিশেষে উদাত্তাদি-স্বর-কাব্যে স্বরের বিশেষের প্রয়োগ সম্বন্ধে যে নির্দেশ আছে, উপযোগিতা আচার্য্য বিশ্বনাথের যুক্তি তাহার খণ্ডনের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া আমরা মনে করি না। বিশ্বনাথ এই সম্বন্ধে দুইটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন—

(১) উদাত্ত প্রভৃতি স্বর ব্যঙ্গ্যরূপ বিশেষ অর্থ প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু অনেকার্থ শব্দের একার্থ-নিয়ন্ত্রণরূপ বিশেষ অর্থ প্রতিপাদন করে না (র)।

(২) যদি স্বীকার করা হয় যে, কেবলমাত্র অনুরূপ স্বরবশেই প্রকরণাদিদ্বারা অনিয়ন্ত্রিত অনেকার্থ শব্দের একার্থ-প্রতিপাদন হইতে পারে, তাহা হইলে শ্লেষ-স্বীকারের আর প্রয়োজন থাকে না; অথচ কাব্যে শ্লেষস্বীকারের প্রয়োজন অত্যধিক (ল)।

(র) স্বরাঃ কাকাদয় উদাত্তাদয়ো বা ব্যঙ্গ্যরূপমেব বিশেষঃ প্রত্যায়য়ন্তি, ন খলু প্রকৃতোক্তমনেকার্থ-শব্দশ্চৈক্যনিয়ন্ত্রণরূপঃ বিশেষম্। (সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(ল) যদি যত্র কচিদনেকার্থশব্দানাং প্রকরণাদি-নিয়মাবাদনিয়ন্ত্রিতয়োপ্যর্থয়োরাহরূপ-স্বরবশেনৈকত্র নিয়মনং বাচ্যং, তদা তথাবিধস্থলে শ্লেষানঙ্গীকারপ্রসঙ্গঃ। (সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—উদাত্তাদি বা কাকু প্রভৃতি স্বরের সাহায্যে যখন ব্যঙ্গার্থ-প্রতিপাদন হয়, তখন অভিধা-মূল-ব্যঞ্জনানিরূপে উক্ত স্বরের উপযোগিতা স্বীকার করিব না কেন? ঐরূপস্থলে ব্যঙ্গার্থের মূলে অভিধা নাই—এমন কথাও বলা চলে না; কারণ, বাক্য থাকিলে তাহার বাচ্যার্থ একটিও অবশ্যই থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্লেষস্থলে স্বরের উপযোগিতা স্বীকার না করিলেও শ্লেষ-ব্যতিরিক্তস্থলে যখন স্বরবিশেষের সাহায্যে বিশেষ অর্থ বুঝা যায়, তখন ঐরূপ স্থলে স্বরের উপযোগিতা স্বীকার করিব না কেন? শ্লেষ হইতে কাকুস্বরের পার্থক্য দর্পণকার নিজেও দশম পরিচ্ছেদে স্বীকার করিয়াছেন। বক্রোক্তি অলঙ্কারে তিনি শ্লেষবক্রোক্তি ও কাকুবক্রোক্তিভেদে দুইটি বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। কাকুস্বর যদি শ্লেষ হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে কাকু-বক্রোক্তির পৃথক স্বীকৃতি অনাবশ্যক হইয়া পড়ে।

উদাত্তাদি-স্বরের ব্যবহার কাব্যে মোটেই নাই—এমন কথা বলা অন্য দিক্ দিয়াও যুক্তিবিগর্হিত। উচ্চ স্বরের নাম উদাত্ত, নিম্নস্বরের নাম অনুদাত্ত এবং এই উভয়ের সংমিশ্রণে যে স্বরের সৃষ্টি হয়, তাহার নাম স্বরিত (ব)। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহাতে উল্লিখিত

(ব) উচ্চৈরুদাত্তঃ। (পাণিনিমুদ্র ১২।২২)

নীচৈরনুদাত্তঃ। (ঐ ১২।৩০)

সমাহারঃ স্বরিতঃ। (ঐ ১২।৩১)

উদাত্তাদি-স্বরত্রয়ের যে কোন একটির সৃষ্টি হইবেই। এমন কোন শব্দ নাই, যাহার উচ্চারণ হইবে, অথচ উচ্চ, নীচ বা উভয়ের সমন্বয়ে উৎপন্ন কোন স্বরের সৃষ্টি হইবে না। সুতরাং স্বীকার করা উচিত যে, উদাত্তাদিস্বরের ব্যবহারও কাব্যে আছে। তবে একথা সত্য যে, উদাত্তাদিস্বর সম্বন্ধে বেদে যত কঠোরতা আছে, কাব্যে ততটা নাই।

কাকুশ্বর এবং হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতভেদে যে অপর তিন প্রকার স্বর আছে, কাব্যে তাহাদের উপযোগিতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কাব্যে ছন্দের প্রাধান্ত অত্যধিক; কিন্তু, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই স্বর দুইটি গণনা না করিলে ছন্দো রচনাই হয় না। মাত্রাবৃত্তেও হ্রস্বস্বরকে একমাত্রা এবং দীর্ঘস্বরকে দ্বিমাত্রা হিসাবে গণনা করা হইয়া থাকে। প্লুতস্বরের মাত্রা যে তিনটি, তাহাও বৈয়াকরণগণ বলিয়াছেন। এমতাবস্থায় কাব্যে স্বরের উপযোগিতা নাই—একথা কেমন করিয়া স্বীকার করি?

“উদাত্তাত্ত্বজ্ঞয়ঃ স্বরাঃ” (অমরকোষ, স্বর্গবর্গ) এই অভিধান অনুসারে কেবলমাত্র উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতকেই স্বর বলিব, হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রাকে স্বর বলিব না—এ কথাও বলা চলে না। উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য হেতু যেমন কাকু প্রভৃতির স্বর স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি হ্রস্ব-দীর্ঘাদিরও স্বর স্বীকার করিতে হইবে।

হ্রস্ব-দীর্ঘাদি স্বরের পার্থক্য থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে

শব্দের অর্থেও বিপুল পার্থক্য থাকিয়া যায়। সলীল শব্দের অর্থ 'লীলার সহিত বর্তমান'। কিন্তু সলিল শব্দের অর্থ 'জল'। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র হ্রস্ব ইকার এবং দীর্ঘ ঙ্গিকারের পার্থক্য হেতু শব্দার্থের কী বিপুল পার্থক্য হইয়া গেল। এইভাবে সূরী শব্দের অর্থ 'সূর্য্যের মাছুষী পত্নী', আর সূরি শব্দের অর্থ 'পণ্ডিত'। এই স্থলেও ইকার এবং ঙ্গিকারের পার্থক্য অর্থের বিপুল পার্থক্য সৃষ্টি করিল।

এই সকল কথা পর্যালোচনা করিয়া আমি বলিতে চাই যে, হ্রস্বদীর্ঘাদি-স্বরভেদও শব্দের অভিধেয়াদি অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে। কাকুশ্বরের বিশেষত্ব যে কাব্যেও স্বীকৃত হয়, 'কাকাক্ষিপ্ত' নামে একটি গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য এবং 'কাকুবক্রোক্তি' নামে একটি অলঙ্কার স্বীকার করিয়া মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিক আচার্য্যগণই এই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছেন।

লক্ষণা

লক্ষণা—লক্ষ + ল্যু + টাপ্ ॥ অভিধা বা শক্তির সাহায্যে
শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহার নাম মুখ্যার্থ।

মুখ্যার্থের সহিত সংযুক্ত, অথচ মুখ্যার্থ নহে
লক্ষণার লক্ষণ এবংবিধ অর্থ যে বৃত্তির সাহায্যে অবগত

হওয়া যায়, তাহার নাম 'লক্ষণা' (ক)।

'হাঙ্গামার স্থানে লাঠি যাইতেছে' বলিলে বুঝা যায়—
'লাঠি লইয়া মানুষ যাইতেছে'। 'লাঠি' শব্দটির স্বাভাবিক
অর্থ 'মানুষ' নহে; কিন্তু কেবল লাঠির পক্ষে যাওয়া
অসম্ভব বলিয়াই এই ক্ষেত্রে লাঠি শব্দটি লাঠিধারী মানুষকে
বুঝাইল। এইভাবে, 'ভারত এই যুদ্ধে
উদাহরণ যোগদান করে নাই' বলিলে 'ভারত' শব্দে
ভারতের গভর্ণমেন্ট বা ভারতীয় সৈন্যকে বুঝায়। ভারত

(ক) মুখ্যার্থবাধে তদ্ব্যোমে রুচিতেহথ প্রয়োজনাত্।

অন্তোহর্থে লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ॥

(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস, কারিকা—২)

মুখ্যার্থবাধে তদ্ব্যুক্তো যস্যন্তোহর্থঃ প্রতীয়তে।

রুচ্যে: প্রয়োজনাদ্ বাসৌ লক্ষণা শক্তিরপিতা ॥

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কারিকা—৫)

শব্দের স্বাভাবিক অর্থ কিন্তু ইহা নহে। স্বাভাবিক অর্থে ভারত শব্দে দেশবিশেষকেই বুঝায়। এইভাবে যখন কোন শব্দ স্বাভাবিক অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই শব্দ লক্ষণা-বৃত্তির সাহায্যে অর্থ প্রকাশ করিতেছে—বলা হইয়া থাকে।

আচার্য্যগণ বলেন—শব্দের এইরূপ অস্বাভাবিক অর্থ বুঝাইবার দুইটি প্রধান হেতু আছে; একটি ‘রুঢ়ি’, এবং অপরটি ‘প্রয়োজন’। ‘হাঙ্গামার স্থানে লাঠি বাইতেছে’

বলিলে, বহু সংখ্যক লাঠি লইয়া মানুষ রুঢ়ি ও প্রয়োজন বাইতেছে—এরূপ বুঝায়। এই ক্ষেত্রে লাঠির সংখ্যাধিক্য বুঝাইবার জন্য লক্ষণা ব্যবহৃত হইয়াছে; অতএব, লক্ষণা-প্রয়োগের হেতু—লাঠির সংখ্যাধিক্য বুঝান রূপ প্রয়োজন (খ)। অপর পক্ষে ‘ভারত যুদ্ধে যোগদান করে নাই’ বলিলে যখন ভারত শব্দে ভারতবর্ষনামক দেশকে না বুঝাইয়া ভারতীয় গবর্ণমেন্ট বা ভারতীয় সৈন্যকে বুঝায়, তখন সেখানে এইরূপ কোন প্রয়োজন দেখা যায় না; এ

(খ) রুঢ়াবুপাদানলক্ষণা যথা—‘শ্বেতো ধাবতি’। প্রয়োজনে, যথা—‘কুস্তাঃ প্রবিশন্তি’। অনয়োহি শ্বেতাতিভিঃ কুস্তাদিভিশ্চাচেতনতয়া কেবলৈর্ধাবনপ্রবেশনক্রিয়য়াঃ কর্তৃত্বায়ত্মমলভমানৈরেতৎসিদ্ধয়ে আত্ম-সম্বন্ধিনোহিহাদয়ঃ পুরুষাদয়শ্চাক্ষিপ্যন্তে। পূর্বত্ব প্রয়োজনাভাবাৎ রুঢ়িঃ। উত্তরত্ব তু কুস্তাদীনামতিগহনত্বং প্রয়োজনম্।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ক্ষেত্রে রুটি বশতঃই লক্ষণার প্রয়োগ হইয়াছে। রুটি শব্দের অর্থ 'প্রসিদ্ধি'। লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে এরূপ প্রয়োগ হয় দেখিয়া ইহাকে 'রুটি' বলা হয় (গ)। আমার বিবেচনায় লক্ষণাতে রুটিরূপ হেতু স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

ভক্তি = ভজ্ + ক্তিন্ ॥ লক্ষণাকে ভক্তিনামেও অভিহিত করা হয়। এই বৃত্তিকে ভক্তি বলা হয় কেন—ইহা ভাবিবার বিষয়। ভজ্ ধাতুর এক অর্থ 'ত্যাগ করা' বা 'দান করা', অন্য অর্থ 'ভাঙ্গিয়া ফেলা', এবং অপর অর্থ 'সেবা করা' (ঘ)। লক্ষণা মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ করে বলিয়াই সম্ভবতঃ তাহাকে ভক্তি নামে অভিহিত করা হয়। তাহা ছাড়া, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি দ্বারা শব্দার্থনির্ণয়ের যে লোক-প্রসিদ্ধ নিয়ম আছে, লক্ষণা সেই নিয়ম ভঙ্গ করে বলিয়াও তাহাকে ভক্তি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। অথবা, যদিও লক্ষণা মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় না, তথাপি মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া সে কার্য্যতঃ মুখ্যার্থেরই সেবা করিয়া থাকে; এই কারণেও তাহার 'ভক্তি' নাম সঙ্গত

(গ) পূর্বত্র (কলিঙ্গ: সাহসিক ইত্যত্র) হেতু রুটি: প্রসিদ্ধিরেব।
উত্তরত্র 'গঙ্গাতটে ঘোষ:' ইতি প্রক্তিপাদনানভ্যশ্চ শীতল-পাবনস্বাতি-
শয়শ্চ বোধনরূপং প্রয়োজনম্। (সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(ঘ) 'ভজ্ বিশ্রাণনে'—চুরাদি, 'ভঙ্গো আমর্দনে'—কুখাদি, 'ভঙ্ক সেবায়াম্'—ভাদি। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

হইতে পারে। ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ (গঙ্গায় গোয়ালাদের গ্রাম) বলিলে গঙ্গা শব্দ গঙ্গাসন্নিহিত তীরকেই বুঝায়; দূরবর্তী স্থান, অথবা গঙ্গা ভিন্ন অন্য নদীর তীরকে বুঝায় না; কাজেই লক্ষণা মুখ্যার্থের সেবা করিতেছে, এরূপ কল্পনা করা অন্তায় নহে। ভক্তি শব্দের এইরূপ নানাবিধ অর্থ কল্পনা করা সম্ভব হইলেও এই স্থলে প্রথমোক্ত অর্থটিকে গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

উপচার—লক্ষণার আর এক নাম ‘উপচার’। ‘উপ (সমীপে) চরতি’—এই অর্থে উপ-চর্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া এই শব্দটি নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। লক্ষণা সকল সময়েই মুখ্যার্থের সহিত সংযুক্ত অর্থে প্রযুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে ‘মুখ্যার্থের সমীপে বিচরণকারী’ বলা চলে। ইহাই উপচার শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ। আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন—সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটি শব্দের মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য থাকার ফলে উহাদিগকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করার নামই উপচার (ঙ)। এই মতে কেবলমাত্র আলঙ্কারিক-সম্মত গোণী-লক্ষণা বা মীমাংসা-সম্মত গোণীবৃত্তিই উপচার নামে অভিহিত হইতে পারে; অন্য লক্ষণা নহে। আমরা ঐদৃশ উপচারকে লক্ষণা বলিয়াই স্বীকার করা সঙ্গত

(ঙ) উপচারো হি নামাত্যন্তং বিশকলিতয়োঃ শব্দয়োঃ সাদৃশ্য-
তিশয়মহিয়া ভেদপ্রতীতিস্বগননমাত্রম্।

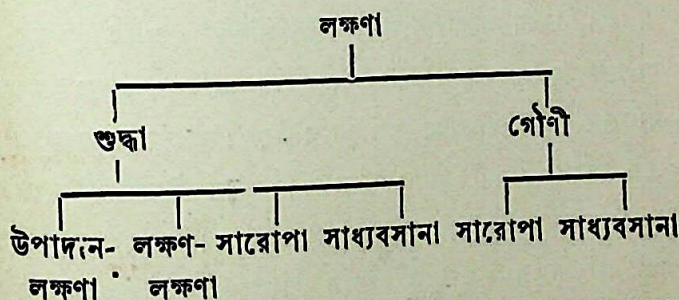
(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

মনে করি না। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

লক্ষণার অস্তিত্ব প্রায় সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু ইহার প্রকারভেদ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। মস্মট ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে

লক্ষণার ছয়টি মৌলিক ভেদ আছে এবং
লক্ষণার বিভাগ

ইহাদের প্রত্যেকটি আবার অব্যঙ্গ্য, গূঢ়ব্যঙ্গ্য ও অগূঢ়ব্যঙ্গ্য-ভেদে ত্রিধা বিভক্ত হওয়ায় লক্ষণাকে মোট ১৮ ভাগে বিভক্ত করা যায় (চ)। ঐ সকল আচার্য্য উল্লিখিত ভেদসমূহের উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্য-প্রকাশের মতানুযায়ী লক্ষণার মৌলিক ভেদ ছয়টি নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।



(চ) লক্ষণা তেন ষড়্‌বিধা।

ব্যঙ্গ্যেন রহিতা ক্লৃঢ়া, সহিতা তু প্রয়োজনে।

তচ্চ গূঢ়মগূঢ়ং বা।

(কাব্য-প্রকাশ, দ্বিতীয় উদ্ভাস

১। উপাদান-লক্ষণা—‘হাস্যামার স্থানে লাঠি বাইতেছে’ বলিলে লাঠিশব্দে লাঠিধারী পুরুষকে বুঝায়। এই স্থানে লাঠিশব্দ নিজের অর্থকেও পরিত্যাগ করে নাই; অথচ নিজের সহিত যুক্ত পুরুষকেও বুঝাইতেছে। এইভাবে নিজের অর্থের উপাদান (গ্রহণ)-পূর্বক অন্ত্যর্থের প্রতিপাদন উপাদান-লক্ষণার ধর্ম (ছ)।

২। লক্ষণ-লক্ষণা—‘গঙ্গায় গোয়ালাদের গ্রাম’ বলিলে গঙ্গাশব্দে গঙ্গাতীরকে বুঝায়; কারণ, গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থ জলপ্রবাহে কোন গ্রাম থাকা সম্ভব নহে। এইস্থলে গঙ্গাশব্দ নিজের অর্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিজের অর্থের সহিত যুক্ত অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহারই নাম—লক্ষণ-লক্ষণা (জ)

৩। শুদ্ধা সারোপলক্ষণা—‘আয়ুষ্মতম্’ (যুতই আয়ুঃ) বলিলে যুতশব্দ মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া আয়ুঃ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ, যুত আয়ুঃ নহে; আয়ুর কারণমাত্র। এই স্থলে বিষয়ী আয়ুঃ এবং বিষয় যুত উভয়েরই উল্লেখ থাকায় ইহাকে সারোপা লক্ষণা বলা হয়। সারোপ-লক্ষণা অর্থ—বিষয়ের (যাহার উপর অন্ত্যর্থের আরোপ হয়)

(ছ) আদাস্থনোচ্যুপাদানাদেবোপাদানলক্ষণা।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(জ) উপলক্ষণহেতুত্বাদেবা লক্ষণ-লক্ষণা।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

আরোপ-পূর্বক লক্ষণা (ঝ)। আয়ুঃ এবং ঘূতের মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকায় মন্মট ভট্ট এই ক্ষেত্রে শুদ্ধা সারোপলক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন (ঞ)

৪। শুদ্ধা সাধ্যবসান-লক্ষণা—‘আয়ুরেবেদম্’ (ইহাই আয়ুঃ) অথবা ‘আয়ুর্বিদম্’ (ইহা আয়ুঃ) বলিলে আয়ুঃ শব্দে যখন ঘূত বা এইরূপ অন্য কোন আয়ুঃজনক পদার্থকে বুঝায়, তখনও আয়ুঃ শব্দে লক্ষণা হয়। এই স্থলে বিষয় ঘূত প্রভৃতির উল্লেখ নাই, কিন্তু ঘূত প্রভৃতি পদার্থ এখানে বুদ্ধি-গম্য; এই কারণে ইহাকে সাধ্যবসানা লক্ষণা বলে। এই ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যরূপ গোণীলক্ষণার হেতু না থাকায় শুদ্ধা লক্ষণা হইল। (শুদ্ধা সারোপলক্ষণার উদাহরণ প্রসঙ্গে কাব্যপ্রকাশের উদ্ধৃতি দেখুন।)

৫। গোণী সারোপ-লক্ষণা—‘গৌর্বাহীকঃ’ (বাহীকটা

(ঝ) সারোপাত্মা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ৌ বিষয়ন্তথা।

(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস, কারিকা—১৪)

আরোপ্যমাণ আরোপবিষয়ন্ত যত্রানপহুতভেদৌ সামানাধিকরণেন নির্দিষ্টেতে, সা লক্ষণা সারোপা। (ঐ, ব্যাখ্যা)

(ঞ) ভেদাবিমৌ চ সাদৃশ্যং সম্বন্ধান্তরতন্তথা।

গৌর্ণৌ শুদ্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ ॥

(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস, কারিকা—১৬)

আয়ুর্ঘূতম্ আয়ুরেবেদমিত্যাদৌ চ সাদৃশ্যাদন্ত্য কার্যাকারণভাবাদি সম্বন্ধান্তরম্। এবমাদৌ চ কার্যাকারণভাবাদিলক্ষণপূর্বে আরোপাধ্য-বসানে। (ঐ, ব্যাখ্যা)

একটা গরু) বলিলে গোশব্দ নিজের মুখ্যার্থ শৃঙ্গলাঙ্গুলাদি-
বিশিষ্ট জন্তু বিশেষকে না বুঝাইয়া বাহীককে (বাহীক-দেশীয়
লোককে) বুঝাইয়া থাকে । এই স্থলে বাহীক অর্থে গো-
শব্দের প্রয়োগ হওয়ার কারণ—উভয়ের গুণগত-সাদৃশ্য ।
গরু যেমন দাঁড়াইয়া মলমূত্র ত্যাগ করে (তিষ্ঠন্মূত্রপূরীষত্ম),
বাহীক দেশের লোকেরাও তেমনি করিয়া থাকে—এইরূপ
বুঝাইবার জন্যই ঐদৃশ প্রয়োগ করা হয় (ট) । এই ক্ষেত্রে
গুণ অর্থ সাদৃশ্য । সাদৃশ্যহেতুক লক্ষণা হয় বলিয়া ইহাকে
গৌণী-লক্ষণা নামে অভিহিত করা হয় । বিষয় বাহীকেরও
উল্লেখ থাকায় ইহা সারোপ-লক্ষণাও বটে ।

কাব্য-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের মতে, গরুর মধ্যে যেমন
জাড়্যমান্দ্যাদি দোষ আছে, বাহীকের মধ্যেও তেমনি এই
সকল দোষ আছে—এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য ‘গৌর্বাহীক’
প্রভৃতি প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখানে জাড়্যমান্দ্যাদিরূপ
সাদৃশ্য স্বীকার করা হইয়াছে—এইমাত্র বিশেষ (ঠ) ।

(ট) যে তিষ্ঠন্তুঃ প্রমেহস্তি যথোষ্টক-দশেরকাঃ । (মহাভারত)

(ঠ) ইমারোপাধ্যবসানরূপৌ সাদৃশ্যহেতু ভেদৌ ‘গৌর্বাহীক’
ইত্যত্র ‘গৌরয়’মিত্যত্র চ । অত্র হি স্বার্থ-সহচারিণৌ জাড়্যমা-
ন্দ্যাদয়ো লক্ষ্যমাণা অপি গোশব্দস্ত পরার্থাভিধানে প্রবৃত্তিনিমিত্ততা-
মুপযাস্তি—ইতি কেচিৎ । স্বার্থ-সহচারিগুণাভেদেন পরার্থগতা গুণা
এব লক্ষ্যন্তে, ন তু পরার্থেহিভিধীয়তে—ইত্যন্তে । সাধারণগুণাশ্রয়ত্বেন
পরার্থ এব লক্ষ্যত ইত্যপরে । (কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস)

‘বাহীক’ শব্দের অর্থসম্বন্ধেও আবার আচার্য্যগণের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন—বাহীক শব্দে দেশবিশেষকে (পঞ্জাব প্রদেশকে) বুঝায়, এবং উক্ত দেশের অধিবাসীদিগকেও বাহীক বলে। অন্তেরা বলেন—বাহীক শব্দে জাঠ নামক জাতিবিশেষকে বুঝায় (ড)। অপরেরা বলেন—“বহির্ভবো বাহীকঃ” এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাহীক শব্দে শাস্ত্রীয়াচার-বহির্ভূত ব্যক্তিকে বুঝায় (ঢ)।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্দ্র পাণ্ডে তাঁহার “Indian Aesthetics” নামক গ্রন্থে পঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী অর্থেই বাহীক শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ‘গৌর্বাহীকঃ’

(ড) পঞ্চানাং সিদ্ধুযষ্ঠানামন্তরং যে সমাপ্রিতাঃ।

বাহীকা নাম তে দেশা ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥

[মহাভারত, কর্ণপর্ব, (পাতঞ্জলমহাভাষ্যব্যাখ্যায় কৈয়টধৃত)]

পঞ্চানাং সিদ্ধুযষ্ঠানাং নদীনাং যেহন্তরাপ্রিতাঃ।

তান্ ধর্মবাহ্যানগুচীন্ বাহীকান্ পরিবর্জয়েৎ ॥

শাকলং নাম নগরমাপগা নাম নিম্নগা।

জন্তিকা নাম বাহীকাস্তেবাং বৃত্তং স্থনিদ্রিতম্ ॥

[মহাভারত, কর্ণপর্ব, ২০০ তম অধ্যায়, (শব্দকল্পদ্রুমধৃত)]

(ঢ) “বহিষষ্ঠিলোপো যঞ্চ,” “ঈকক্ চ” ইতি বার্ত্তিকধ্বয়েন বহিঃশব্দশ্চ টিলোপে ঈকক্-প্রত্যয়ে চ কৃতে ব্যবয়োরভেদাদ্ বাহীক ইতি রূপমিত্যাহঃ। (বালবোধিনী)

কথাটির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন—“This Punjabi is a bull.”

বাংলা দেশের কোন কোন অধ্যাপক ভারবাহী অর্থে বাহীক শব্দটিকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে গো এবং বাহীকের মধ্যে জাড্য-মান্দ্যাদিরূপ সাদৃশ্য কল্পিত হওয়ার ফলেই ইহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ, কোন প্রাচীন গ্রন্থেই উক্ত অর্থে বাহীক শব্দের প্রয়োগ না থাকায় এই মতটি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। জাড্য-মান্দ্যাদিগুণ যেমন ভারবাহীর মধ্যে কল্পনা করা যায়, তেমনি বাহীক দেশের লোকের মধ্যেও ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে। পঞ্চনদের উপত্যকাভূভাগ পূর্বকালে বর্ধমানের চেয়েও অধিকতর উর্বর এবং শস্যসমৃদ্ধ ছিল। এইরূপ স্থানের অধিবাসীরা অল্প পরিশ্রমেই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, এবং ফলে তাহাদের মধ্যে স্বভাবতই জাড্যমান্দ্যাди দোষ জন্মিয়া থাকে।

৬। গোঁণী সাধ্যবসান-লক্ষণা—‘গৌরয়ম্’ (এটা একটা গরু) বলিলেও গোশব্দ বাহীক প্রভৃতি অন্ত্যার্থে ব্যবহৃত হওয়ায় লক্ষণা হইল। এইস্থলে বিষয় বাহীক প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ না থাকায় ইহা সাধ্যবসানা, এবং গো ও বাহীকাদির গুণগত সাদৃশ্যহেতু লক্ষণা হওয়ায় মন্যট ভট্টের মতে ইহা গোঁণী লক্ষণাও বটে।

আচার্য্য জয়দেব তাঁহার চন্দ্রালোক নামক গ্রন্থে মন্যট

ভট্টের এই ছয়টি মৌলিক ভেদই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা
 ছাড়া প্রকারান্তরে অন্যভাবেও লক্ষণা হয়
 জয়দেবের মত বলিয়া তিনি লক্ষণার মধ্যে আরও কতক-
 গুলি অবাস্তুর বিভাগও দেখাইয়াছেন।

জয়দেব বলেন—শব্দ ও অর্থের বৈশিষ্ট্য অনুসারে লক্ষণাকে
 দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। তাঁহার মতে ‘রসসমৃদ্ধ কাব্য
 অমৃত’ বলিলে এইস্থলে অর্থ-বৈশিষ্ট্যহেতু লক্ষণা হয়।
 অপর পক্ষে ‘বিদ্যা সকল ধনের সার’ বলিলে শব্দের বৈশিষ্ট্য-
 হেতু লক্ষণা হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, কাব্য ও অমৃত
 সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু বটে, তথাপি রসসমৃদ্ধ কাব্যের বিষয়বস্তু
 বা বর্ণনাভঙ্গী অমৃতেরই মত আনন্দদায়ক—এই অর্থে রস-
 সমৃদ্ধ কাব্যকে অমৃত বলা হয়; অতএব, এক্ষেত্রে কাব্যের
 অর্থগত বৈশিষ্ট্যই লক্ষণাবৃদ্ধির হেতু হইল। ‘বিদ্যা সকল
 ধনের সার’ বলিলে বিদ্যা শব্দের তাদৃশ কোন অর্থগত
 বৈশিষ্ট্য বিবক্ষিত হয় না। এই ক্ষেত্রে বিদ্যা শব্দটির মধ্যেই
 এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার ফলে, তাহাকে সকল ধনের
 সার বলিতে কাহারও আপত্তি থাকে না। এই জন্য এক্ষেত্রে
 শব্দগত বৈশিষ্ট্যই লক্ষণা-স্বীকারের হেতু (৭)।

(৭) লক্ষ্য-লক্ষ্যকবৈশিষ্ট্য-বৈশিষ্ট্যাদ্ দ্বিবিধা পুনঃ।

সরসং কাব্যমমৃতং বিদ্যা স্থিরতরং ধনম্ ॥

(চন্দ্রালোক, নবম ময়ূখ, কারিকা—১৪)

লক্ষ্যেতি। তৎকার্য্যকারিত্বসম্বন্ধেনামৃতপদেন বিশিষ্টকাব্যে

জয়দেব আবার সহেতু ও নিহেতু ভেদে লক্ষণাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'সে সৌন্দর্য্যে কন্দর্প' এই বাক্যে ব্যক্তিবিশেষকে কন্দর্প বলিয়া অভিহিত করার হেতু — তাহার সৌন্দর্য্য। অপর পক্ষে 'তিনি মূর্ত্তিমতী রতি' এই বাক্যে তাদৃশ হেতুভূত শব্দের উল্লেখ নাই। প্রথম দৃষ্টান্তে হেতুর উল্লেখ থাকায় জয়দেবের মতে তাহাতে সহেতু-লক্ষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তাদৃশ হেতুর উল্লেখ না থাকায় তাহাতে নিহেতু-লক্ষণা হইয়াছে (ত)।

জয়দেব বিভিন্ন প্রকার লক্ষণার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মতে রূঢ়ি ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণার যে দুইটি বিভাগ আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে আবার লক্ষণীয় শব্দের প্রয়োগ ও অপ্ৰয়োগ দেখিয়া দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। 'অগ্নির্মাণবকঃ' 'শুক্লো ঘটঃ' প্রভৃতিস্থলে লক্ষণীয় শব্দ 'মাণবক' ও 'ঘট' এর প্রয়োগ আছে; কিন্তু 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'

সুখজনকত্বং লক্ষ্যতে। 'স্থিরতরং ধন'মিতি পদদ্বয়েন চ বিশিষ্টধন-কার্য্যাকারিত্বসম্বন্ধেন সুখজনকত্বং বিজ্ঞায়াম্। তত্র বৈশিষ্ট্যং লক্ষ্যম্, অত্র বিশিষ্টং লক্ষকমিতি ভেদঃ। ... (রাকাগমটীকা)

(ত) তথা সহেতুরতথাভেদভিন্না চ কুত্রচিৎ।

সৌন্দর্য্যেণৈব কন্দর্পঃ সা চ মূর্ত্তিমতী রতিঃ ॥

(চন্দ্রালোক, নবম ময়ূখ, কারিকা—১৫)

তথেন্তি। উদাহরণে সৌন্দর্য্যেণেতি হেতুঃ। সা চেতি দ্বিতীয়োদাহরণম্।

(ঐ, রাকাগমটীকা)

স্থলে লক্ষণীয় বালকাদি-শব্দের প্রয়োগ নাই।

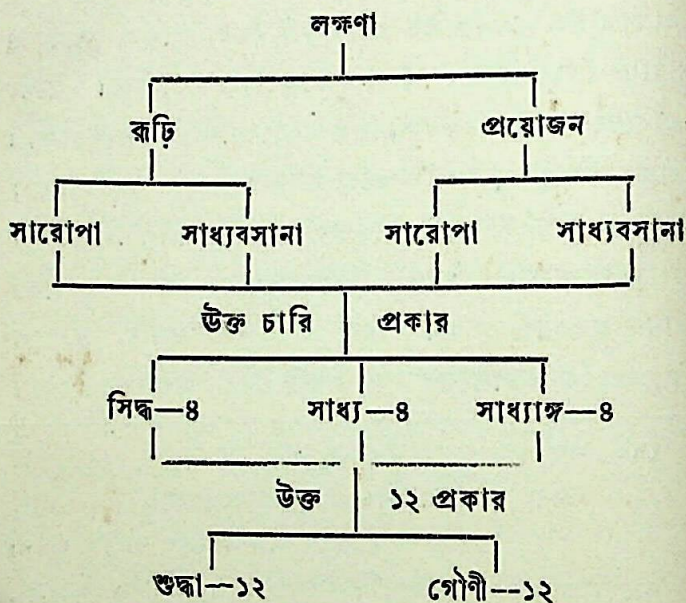
উল্লিখিত ভেদগুলির প্রত্যেকটি আবার সিদ্ধ, সাধ্য ও সাধ্যাঙ্গ ভেদে ত্রিবিধ। সিদ্ধ = উদ্দেশ্যবাচকপদনিষ্ঠ। সাধ্য = বিধেয়বাচকপদনিষ্ঠ। সাধ্যাঙ্গ = বিধেয়ায়্যিবাচক-পদনিষ্ঠ। সিদ্ধের উদাহরণ, যথা—‘ওরে গর্দভ! তুই বুঝবি না’। এই স্থলে গর্দভ শব্দের উদ্দেশ্যবাচকমূৰ্খত্বে লক্ষণা হইয়াছে। ‘কামিনীবচনামৃত’ পদে বিধেয়-বাচক অমৃত পদের আনন্দ-জনকত্বে লক্ষণা এবং ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ বলিলে বিধেয়বাচক গঙ্গাশব্দের গঙ্গাসম্বন্ধিত্বের লক্ষণা হয় (খ)।

(খ) লক্ষণীয়স্ত শব্দস্ত মীলনামীলনাদ্ দ্বিধা।

লক্ষণা সা ত্রিধা সিদ্ধ-সাধ্য সাধ্যাঙ্গভেদতঃ ॥

(চন্দ্রালোক, নবম মণ্ডল, কারিকা ॥—২)

লক্ষণীয়শ্চেতি। লক্ষণীয়ার্থবাচকশব্দস্ত মীলনং সমভিব্যাহারঃ, অমীলনমসমভিব্যাহারঃ, তেন দ্বিধা। সিদ্ধম্ উদ্দেশ্যম্, সাধ্যং বিধেয়ম্, সাধ্যাঙ্গং বিধেয়ায়্যি, তদ্বাচকপদনিষ্ঠত্বেন দ্বিধাপি ত্রিধেত্যর্থঃ। পূর্বোক্তা দ্বিধাপি লক্ষণা লক্ষ্যার্থবাচক-পদসমভিব্যাহৃত-তদসমভিব্যাহৃতপদনিষ্ঠত্বেন দ্বিধা। ‘অগ্নির্মাণবকঃ’, ‘শুক্লো ঘট’ ইত্যাদাবাচ্য। ‘মঞ্চাঃ ক্রোশন্তী’ত্যাদৌ দ্বিতীয়েতি। এবং দ্বিধাপি উদ্দেশ্যবাচক-পদনিষ্ঠা, বিধেয়বাচকপদনিষ্ঠা, বিধেয়ায়্যিবাচকপদনিষ্ঠেতি ত্রিধা। যথা—‘ভো বৃষ! ন বুধ্যসে’ ইত্যাদৌ বৃষপদশ্চোদ্দেশ্যবাচিনো মূৰ্খত্বে, ‘কামিনীবচোহমৃত’মিতি বিধেয়বাচিনোহমৃতপদস্বানন্দজনকত্বে, ‘গঙ্গায়াং ঘোষ’ ইত্যাদাবুদ্দেশ্যবিধেয়বাচিবিধেয়ঘোষায়্যিবাচিনি গঙ্গাপদে ইতি ভাবঃ। (ঐ রাকাগম টীকা)



প্রয়োজনে যে ১২ রকমের লক্ষণা প্রদর্শিত হইল, জয়দেবের মতে তাহাদের প্রত্যেকটিতে আবার অবাস্তুর-বিভাগ আছে। তিনি বলেন—ক্ষুট ও অক্ষুটভেদে প্রয়োজন দ্বিবিধ, এবং এই দুই প্রকারের প্রত্যেকটি আবার শব্দনিষ্ঠ ও অর্থনিষ্ঠভেদে দুই প্রকার। কাজেই, প্রয়োজনে লক্ষণার বিভাগ $১২ \times ৪ = ৪৮$ টি হইল। ইহার সহিত রূঢ়িলক্ষণার ১২টি বিভাগ যোগ করিলে লক্ষণা $৪৮ + ১২ = ৬০$ প্রকার হইতেছে।

জয়দেব বলেন—শব্দে, পদার্থে, বাক্যার্থে, সংখ্যায়, কারকে এবং লিঙ্গে লক্ষণা গৃহীত হইয়া থাকে (দ) ।

উল্লিখিত ৬০ প্রকারের প্রত্যেকটিকে যদি এই ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে লক্ষণা $(৬০ \times ৬ =)$ ৩৬০ প্রকার হইয়া পড়ে, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিকে এইরূপ ৬ ভাগে বিভক্ত করা যায় কি না, এ সম্বন্ধে জয়দেব কিছুই বলেন নাই ।

সাহিত্যদর্পণের মতে লক্ষণা ৮০ প্রকার । এই গ্রন্থে আচার্য্য বিশ্বনাথ পৌনঃপুনিক গুণন-প্রক্রিয়াদ্বারা লক্ষণার ৮০টি বিভাগ প্রদর্শন করিয়া ইহাদের উদাহরণও দিয়াছেন ।

তিনি প্রথমেই রূঢ়ি ও প্রয়োজনভেদে সাহিত্যদর্পণের মত লক্ষণাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । তাঁহার মতে ইহাদের প্রত্যেকটি আবার উপাদান-লক্ষণা ও লক্ষণ-লক্ষণাভেদে দ্বিবিধ । এইরূপে প্রাপ্ত চারিটি বিভাগের প্রত্যেকটি আবার সারোপা ও সাধ্যবসানাভেদে দ্বিধা বিভক্ত । এইভাবে প্রাপ্ত আটটি বিভাগের প্রত্যেকটিকে তিনি আবার শুদ্ধা ও গোণীভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । এক্ষণে রূঢ়িতে $৮ +$ প্রয়োজনে $৮ = ১৬$ প্রকারের ভেদ হইল (ঘ) ।

(দ) শব্দে পদার্থে বাক্যার্থে সংখ্যায়ঃ কারকে তথা ।

লিঙ্গে চেয়মলকারাকুরবীজতয়া স্থিতা ॥

(চন্দ্রালোক, নবম ময়ূখ, কারিকা—১৬)

(ঘ) মুখ্যার্থবাধে, তদযুক্তো যস্যাত্তোহর্থঃ প্রতীয়তে ।

প্রয়োজনে যে আটটি বিভাগ প্রদর্শিত হইল, ইহাদের প্রত্যেকটিকে আবার তিনি গূঢ়বাক্য্য ও অগূঢ়বাক্য্য হিসাবে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এইরূপে প্রাপ্ত প্রয়োজনের ১৬টি বিভাগকে আবার ধর্ম্মগত ও ধর্ম্মগতভেদে দ্বিধা বিভক্ত করায় প্রয়োজনে লক্ষণা ৩২ প্রকার পাওয়া গেল (ন)।

পূর্ব্বে রূঢ়িতে যে আটটি বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রয়োজনের এই ৩২টি বিভাগ যোগ করিলে লক্ষণা ৪০ প্রকারের হইল। ইহাদের প্রত্যেকটিকে আবার পদগত ও বাক্যগতভেদে দ্বিধা বিভক্ত করায় দর্পণকারের

রুঢ়ে: প্রয়োজনাদ্ বাসৌ লক্ষণা শক্তিরপিতা ॥

মুখ্যার্থশ্চেত্তরাঙ্কেপো বাক্যাথে'হময়সিদ্ধয়ে ।

শ্রাদান্ননোহপ্যুপাদানাদেষোপাদানলক্ষণা ॥

অর্পণং স্বশ্চ বাক্যাথে'পরশ্রায়সিদ্ধয়ে ।

উপলক্ষণহেতুত্বাদেযা লক্ষণ-লক্ষণা ॥

আরোপাধ্যবসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা ।

সাদৃশ্চেত্তরসম্বন্ধাঃ শুদ্ধাস্তাঃ সকলা অপি ॥

সাদৃশ্যত্ব মতা গোণ্যন্তেন মোড়শভেদিতাঃ ।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(ন) বাক্যাস্ত গূঢ়াগূঢ়াদ্ দ্বিধা স্ত্য: ফললক্ষণাঃ ।

ধর্ম্মি-ধর্ম্মগতভেন ফলশ্চেতা অপি দ্বিধা ॥

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

মতে লক্ষণা ৮০ প্রকার (প)।

আচার্য্য অশ্বয়দীক্ষিত তাঁহার বৃত্তিবাস্তিক নামক গ্রন্থে
গৌণী ও শুদ্ধাভেদে লক্ষণাকে দুইভাগে
অশ্বয়দীক্ষিতের মত বিভক্ত করিয়া ইহাদের প্রত্যেকটির আবার
নিরুঢ়-লক্ষণা ও ফল-লক্ষণাভেদে দুইটি অবাস্তুর বিভাগ
প্রদর্শন করিয়াছেন (ফ)।

তাঁহার মতে ফল-লক্ষণা সাত প্রকার ; যথা—(১) জহ-
লক্ষণা, (২) অজহলক্ষণা, (৩) জহদজহলক্ষণা, (৪) সারোপা,
(৫) সাধাবসানা, (৬) শুদ্ধা. এবং (৭) গৌণী। ইহাদের
প্রত্যেকটির উদাহরণও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার
মতে ব্যতিরেক-লক্ষণা জহলক্ষণার অন্তর্গত (ব)।

লক্ষণার প্রকারভেদ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদের মধ্যে কিছু

(প) তদেবং লক্ষণাভেদাশ্চত্বারিংশম্ভাৱতা বুধৈঃ।

পদবাক্যগতেন প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা ॥

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

(ফ) তন্মাং সাদৃশ্চগুৰ্ত-তদন্তসম্বন্ধনিমিত্ততয়া গৌণী শুদ্ধা চেতি
লক্ষণায়া এব দ্বৈবিধ্যম্। ইয়ঞ্চ দ্বিবিধাপি লক্ষণা প্রত্যেকং দ্বিবিধা—
নিরুঢ়লক্ষণা, ফললক্ষণা চেতি। রুঢ়িতুল্যতয়া নিরুঢ়লক্ষণা। বিবক্ষি-
তার্থাস্তরম্বোতনফলা ফল-লক্ষণা। (বৃত্তিবাস্তিক)

(ব) জহলক্ষণা, অজহলক্ষণা, জহদজহলক্ষণা, সারোপা, সাধাবসানা
চ। শুদ্ধা চ গৌণী চ, ইত্যেবং সপ্তবিধা ফললক্ষণা। (বৃত্তিবাস্তিক)
ব্যতিরেকলক্ষণাপি জহলক্ষণাপ্রভেদ এব। (ঐ)

মতভেদ দেখা যায়। আচার্য্য জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁহার ‘শব্দশক্তি-প্রকাশিকা’ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন
 নৈয়ায়িকদের মত যে, জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরুঢ়া, আধুনিকী
 প্রভৃতি ভেদে লক্ষণার মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ আছে (ভ)।
 যে লক্ষণাতে লক্ষক পদ নিজের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া
 অপর অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহারই নাম ‘জহৎস্বার্থা’। যে
 লক্ষণাতে লক্ষক পদ নিজের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া
 বাচ্যার্থের সহিত একযোগে লক্ষ্যার্থকেও বুঝায়, তাহার নাম
 ‘অজহৎস্বার্থা’।

জহৎস্বার্থা = জহতি (পদানি) স্বার্থং যস্ত্যাং সা।

অজহৎস্বার্থা = ন জহতি (পদানি) স্বার্থং যস্ত্যাং সা।

জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে, যখন বর্ণবাচক অরূপ শব্দ-
 দ্বারা অরূপবর্ণবিশিষ্ট কোন পদার্থকে বুঝান হয়, তখন
 নিরুঢ়-লক্ষণা এবং যখন ঘট প্রভৃতি শব্দদ্বারা পট প্রভৃতিকে
 বুঝান হয়, তখন আধুনিকী লক্ষণা হইয়া থাকে। কয়েকজন
 লোক মিলিয়া যদি এমন একটি সাস্থ্যেতিক নিয়ম প্রবর্তন
 করে যে, অতঃপর তাহারা পট অর্থে ঘট শব্দ ব্যবহার
 করিবে, এবং ইহার পর হইতে ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে
 থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল লোকের নিকট ঘটশব্দে পট-

(ভ) জহৎস্বার্থা-অজহৎস্বার্থ-নিরুঢ়া-আধুনিকাদিকাঃ।

লক্ষণা বিবিধান্তাভিলক্ষকং শ্রাদনেকধা ॥

(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, কারিকা—২৫)

পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া জগদীশ তর্কালঙ্কার মনে করেন। ইহাই তাঁহার মতে আধুনিক লক্ষণার উদাহরণ। আধুনিক লোকদের দ্বারা ঐরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হয় বলিয়া ইহার নাম আধুনিকী (ম)।

আচার্য্য বিশ্বনাথ পঞ্চানন লক্ষণার মধ্যে মাত্র দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—(১) অজহংস্বার্থী, এবং (২) লক্ষিতলক্ষণা বা জহংস্বার্থী। উক্ত দুই প্রকার লক্ষণার উদাহরণও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন (ঘ)।

আচার্য্য জগদীশ ভট্টাচার্য্যও তাঁহার 'তর্কামৃতম্' নামক গ্রন্থে জহংস্বার্থী ও অজহংস্বার্থী ভেদে লক্ষণার মধ্যে মাত্র দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন (র)।

(ম) কাচিলক্ষ্যতাবচ্ছেদকীভূত-তত্ত্বজ্ঞাপেণ পূর্বং পূর্বং প্রত্যয়-কত্মান্নিকৃতা, যথা—আরুণ্যাদি-প্রকারেণ তদাশ্রয়ত্রব্যাহুভাবকত্বাদিক-ণাদিপদস্ত। কাচিল পূর্বং পূর্বং তাদ্‌রূপোণাপ্রত্যয়কত্বাদাধুনিকী, যথা—ঘটত্বাদিনা পটাদিপদস্ত। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)

(ঘ) এবং ছত্রিণো যান্তীত্যাদৌ ছত্রিপদশ্লোকসার্থবাহিত্বে লক্ষণা। ইয়মেবাজহংস্বার্থী লক্ষণেত্যাচ্যতে। একসার্থবাহিত্বেন রূপেণ ছত্রি-তদন্তর্য্যোর্বোধাত্।

যত্র তু শকার্থস্য পরম্পরাসম্বন্ধরূপা লক্ষণা সা লক্ষিতলক্ষণে-ত্যাচ্যতে। যথা—দ্বিরেকাদিপদে রেফদ্বয়সম্বন্ধো ভ্রমরপদে জ্ঞায়তে। (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

(র) লক্ষণা দ্বিবিধা—জহংস্বার্থী, অজহংস্বার্থী চ। (তর্কামৃতম্)

নৈয়ায়িকেরা গোণী বৃত্তিকে লক্ষণার অন্তর্গত বলিয়াই মনে করেন (ল)।

‘বেদান্ত-পরিভাষা’ নামক গ্রন্থে প্রথমতঃ লক্ষণাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(১) কেবললক্ষণা, এবং (২) লক্ষিতলক্ষণা।

বেদান্ত-মত

উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য্য ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন—যে স্থলে শক্যার্থের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, সেই স্থলে কেবল-লক্ষণা, এবং যে স্থলে শক্যার্থের সহিত পরম্পরাসম্বন্ধ থাকে, সেইস্থলে লক্ষিত-লক্ষণা হয়। তাঁহার মতে কেবল-লক্ষণার উদাহরণ—‘গঙ্গায়াং ধোষঃ’; এবং লক্ষিত-লক্ষণার উদাহরণ—‘দ্বিরেক’ প্রভৃতি শব্দ। তিনি বলেন, গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থ জলপ্রবাহের সহিত গঙ্গাতীরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ভ্রমরের সহিত দ্বিরেক-শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ভ্রমর শব্দে যেমন দুইটি রংকার আছে, দ্বিরেক শব্দেও তেমনি দুইটি রংকার বিद्यমান দেখিয়াই এই পরম্পরা-সম্বন্ধের বলে দ্বিরেক-শব্দদ্বারা লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে ভ্রমরকে বুঝান হয়। তাঁহার মতে গোণীলক্ষণা লক্ষিতলক্ষণারই নামান্তর। গোণী-লক্ষণার উদাহরণ ‘সিংহো মাণবকঃ’ প্রভৃতি স্থলে সিংহাদি-

(ল) আদিना शक्यसदृशप्रकारेण बोधकतया गोण्युपगृह्यते।

(शब्दशक्तिप्रकाशिका, २५१ कारिका व्याख्या)

গোণীবৃত্তিরপি লক্ষণৈব, যথাগ্নিমাণবকঃ, গোবাহীকঃ। অত্র লক্ষণয়াগ্নাদিসাদৃশং প্রতীয়তে। (তর্কামৃতম্)

শব্দের সহিত মাণবকাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তিনি মনে করেন (ব)।

উক্ত ঐশ্বক্যের মতে, অন্য প্রকারেও লক্ষণাকে তিন-ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) জহল্লক্ষণা, (২) অজহল্লক্ষণা, এবং (৩) জহদজহল্লক্ষণা। ঐগুলির উদাহরণও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। জহল্লক্ষণা, যথা—বিষং ভুজ্জু; অজহল্লক্ষণা, যথা—শুক্লো ঘটঃ; জহদজহল্লক্ষণা, যথা—কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্ (শ)।

মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি অন্যান্য বৈদান্তিকগণও

(ব) লক্ষণা চ বিবিধা—কেবল-লক্ষণা লক্ষিতলক্ষণা চেতি। তত্র শক্যাসাক্ষাৎসম্বন্ধঃ কেবললক্ষণা; যথা—গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র প্রবাহ-সাক্ষাৎসম্বন্ধিনি তীরে গঙ্গাপদস্য কেবললক্ষণা। যত্র শক্য-পরম্পরাসম্বন্ধেনার্থান্তরপ্রতীতিস্তত্র লক্ষিত-লক্ষণা; যথা—দ্বিরেকপদস্য রেকদ্বয়ে শক্যস্য ভ্রমরপদঘটিতপরম্পরাসম্বন্ধেন মধুকরে বৃত্তিঃ।

গৌণ্যপি লক্ষিতলক্ষণৈব। যথা সিংহো মাণবক ইত্যত্র সিংহ-শব্দবাচ্যসম্বন্ধিক্রৌর্যাদিসম্বন্ধেন মাণবকস্য প্রতীতিঃ।

(বেদান্ত-পরিভাষা, আগমপরিচ্ছেদ)

(শ) প্রকারান্তরেণ লক্ষণা ত্রিবিধা। জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা, জহদজহল্লক্ষণা চেতি। তত্র শক্যমনস্তর্ভাব্য যত্রার্থান্তরপ্রতীতিস্তত্র জহল্লক্ষণা। যথা—‘বিষং ভুজ্জু’ ইত্যত্র স্বার্থঃ বিহায় শত্রুগৃহে ভোজননিবৃত্তিলক্ষ্যতে। যত্র শক্যার্থমস্তর্ভাব্যার্থান্তরপ্রতীতিস্তত্র জহল্লক্ষণা। যথা ‘শুক্লো ঘট’ ইত্যত্র হি শুক্লশব্দঃ স্বার্থঃ শুক্লগুণমস্তর্ভাব্য তদ্বতি দ্রব্যে লক্ষণয়া বর্ততে। (বেদান্ত-পরিভাষা, আগমপরিচ্ছেদ)

লক্ষণার বিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ মতই পোষণ করেন।

আচার্য্য মন্মট ভট্ট লক্ষণা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। উক্ত আচার্য্য শুদ্ধা ও গোণীভেদে লক্ষণাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া শুদ্ধার মধ্যে চারিটি এবং গোণীর মধ্যে দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইভাবে, তাঁহার মতে লক্ষণার মৌলিক ভেদ ছয়টি (লক্ষণা তেন ষড়বিধা)। আচার্য্য মন্মটের মতে সারোপা ও সাধ্যবসানার প্রত্যেকটি শুদ্ধা ও গোণী ভেদে দুইপ্রকার হইতে পারে বটে, কিন্তু উপাদানলক্ষণা ও লক্ষণ-লক্ষণা কেবল শুদ্ধাই হয়; কখনও গোণী হইতে পারে না। অধিকন্তু, তিনি উপাদান-লক্ষণা ও লক্ষণ-লক্ষণার মধ্যে সারোপা ও সাধ্যবসানা ভেদে অবাস্তুর বিভাগ স্বীকার করেন না।

মন্মটাচার্য্যের এই মত কি সমর্থনযোগ্য? তাঁহার

মন্মট ভট্টের মতের

সমালোচনা

মতে গোণী ও শুদ্ধার পার্থক্য এই যে, যখন

আরোপ্যমাণ ও আরোপবিষয়ের মধ্যে

সাদৃশ্য-সম্বন্ধ হেতু অভেদ কল্পনা করা হয়,

তখন তাহাকে গোণী-লক্ষণা এবং যখন সাদৃশ্যভিন্ন অত

সম্বন্ধ হেতু অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন তাহাকে শুদ্ধা লক্ষণা

বলে। তাঁহার মতে 'গৌর্বাহীকঃ' বলিলে গোণী সারোপ-

লক্ষণা, এবং 'গৌরয়ম্' বলিলে গোণী সাধ্যবসানলক্ষণা

হয়। উল্লিখিত স্থলে গো প্রভৃতি শব্দ 'বাহীক' প্রভৃতিকে

বুঝাইতেছে বলিয়া লক্ষণা হইল। বাংলাতেও আমরা 'এই কুলিটা একটা আস্ত গাধা' এবং 'ও একটা আস্ত গাধা' এইরূপ বাক্য প্রায়ই শুনিয়া থাকি।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, উল্লিখিত স্থলে গো প্রভৃতি শব্দ যখন বাহীক প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন কি সে উপাদান-লক্ষণা ও লক্ষণলক্ষণার কোনটিতেই পড়ে না? মন্মট ভট্ট নিজেই বলিয়াছেন—যে স্থলে কোন শব্দ সংসংযুক্ত-অপরার্থের বোধক হয়, সেইস্থলে উপাদান-লক্ষণা এবং যে স্থলে স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া অপরার্থের বোধক হয়, সেইস্থলে লক্ষণ-লক্ষণা হইয়া থাকে; এতদ্-ব্যতিরিক্তি অর্থে লক্ষণাই হয় না। উল্লিখিত উদাহরণে গো-শব্দ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বাহীক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিলে লক্ষণ-লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; আর গো-সহচরিত-তিষ্ঠান্মূত্রপূরীষত্বাদি বা জাড্যমান্দ্যাদি গুণের সহিত সংযুক্ত বাহীককে বুঝাইতেছে—এইরূপ বলিলেও উপাদান-লক্ষণা হইয়া পড়ে। অতএব, গোণী সারোপা বা সাধ্যবসানাস্থলেও উপাদান-লক্ষণা বা লক্ষণলক্ষণা যে কোন একটিকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

মন্মট ভট্ট বলেন—'আয়ুষ্মতম্' বলিলে শুদ্ধা সারোপলক্ষণা এবং 'আয়ুরবেদম্' বলিলে শুদ্ধা সাধ্যবসানলক্ষণা হয়। এক্ষেত্রেও আয়ুঃ শব্দ মুখ্যার্থে ব্যবহৃত না হইয়া ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার ফলেই লক্ষণা হইল; সুতরাং পরার্থে

স্বার্থের সমর্পণ করার ফলে লক্ষণ-লক্ষণা হইয়াছে।

উপাদান-লক্ষণার উদাহরণরূপে তিনি 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি' এই বাক্যটি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে কি সারোপা বা সাধ্যবসানা কোনটিরই প্রবেশ হয় না? তিনি নিজেই বলিয়াছেন—যে স্থলে বিষয়ী ও বিষয় (আরোপ্যমাণ ও আরোপ-বিষয়) উভয়েরই উল্লেখ থাকে, সেই ক্ষেত্রে সারোপা, এবং যে স্থলে একটির উল্লেখ থাকে না, সেই-স্থলে সাধ্যবসানা লক্ষণা হইয়া থাকে (য)। উল্লিখিত বাক্যে কেবল বিষয় কুন্তা শব্দেরই উল্লেখ আছে, বিষয়ী পুরুষাদির উল্লেখ নাই; অতএব সাধ্যবসানা লক্ষণা হইল। 'এতে কুন্তাঃ প্রবিশন্তি' বলিলে 'এতে' পদদ্বারা বিষয়ীরও উল্লেখ হওয়ার সারোপা লক্ষণা হইবে। এইভাবে 'শ্বেতো ধাবতি' বলিলে উপাদান-লক্ষণা সাধ্যবসানা, এবং 'অশ্বঃ শ্বেতো ধাবতি' বা 'অয়ং শ্বেতো ধাবতি' বলিলে উপাদান-লক্ষণা সারোপা হইবে। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই মন্মট-প্রদর্শিত লক্ষণ-লক্ষণার উদাহরণে বিষয়ীর উল্লেখ না থাকায় সাধ্যবসানা এবং 'অস্তাং গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলিলে বিষয়ীরও উল্লেখ থাকায় সারোপা লক্ষণা হইবে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মন্মট-

(য) সারোপাত্মা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা।

বিষয়ন্তঃকৃতেহত্মিন্ সা স্তাং সাধ্যবসানিকা ॥

(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস)

চার্যের মূলনীতি অনুসারে উপাদান-লক্ষণা এবং লক্ষণ-লক্ষণা গোণীও হইতে পারে, এবং ইহাদের প্রত্যেকটি আবার সারোপা ও সাধ্যবসানাভেদে দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার পক্ষে কোন অন্তরায় নাই। এমতাবস্থায় উক্ত আচার্যের 'লক্ষণা তেন ষড়্বিধা' কথাটি আমরা কি ভাবে সমর্থন করিতে পারি ?

বস্তুতঃ, গোণী নামে লক্ষণার মধ্যে অবাস্তুর বিভাগ স্বীকার করা যে আমাদের বিবেচনায় অযৌক্তিক, উপক্রম-নিকাতেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। সম্ভ্রতি এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিতেছি। 'গৌবাহীকঃ' বা 'গৌরয়ম্' বলিলে যে গো-শব্দ গো-সহচরিত-জাড্যমান্দ্যাদি-সদৃশ-জাড্যমান্দ্যাদিবিশিষ্ট বা তিষ্ঠন্মূত্রপূরীষত্বাদিগুণসদৃশ-গুণবিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা কি লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে ? গো-শব্দের শব্দার্থ—শৃঙ্গলাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট জন্তু বিশেষ। এই অর্থটি বাহীক-শব্দার্থের সহিত অম্বিত না হওয়ার দ্বিতীয় কক্ষায় অর্থপ্রকাশের জন্য লক্ষণাবৃত্তির প্রবেশ ঘটিল। লক্ষণা মুখ্যার্থের সহিত সংযুক্ত অর্থমাত্রই প্রতিপাদন করিতে পারে, ইহার অতিরিক্ত নহে ;—এ কথা সর্ববাদি-সম্মত। এই ক্ষেত্রে গোশব্দ লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে 'গোসহচরিতজাড্যমান্দ্যাদি' বা 'তিষ্ঠন্মূত্রপূরীষত্বাদি' ধর্মকেই বুঝাইতে পারিল। কিন্তু এই অর্থটিও বাহীকশব্দার্থের সহিত অম্বিত না হওয়ায় তৃতীয় কক্ষায় 'গোসহচরিতজাড্য-

মান্দ্যাদিসদৃশজাড্যমান্দ্যাদিবিশিষ্ট' বা 'গোসহচরিত্তিষ্ঠমূত্র-
পুরীষহাদিগুণসদৃশ-গুণবিশিষ্ট'রূপ অর্থ প্রতিপাদনের জন্য
তৃতীয় আর একটি বৃত্তির প্রবেশ ঘটিল। ইহাই মীমাংসা-
সম্মত গোণীবৃত্তি। লক্ষণা দ্বিতীয় কক্ষায় অর্থ প্রতিপাদন
করিয়া বিরত হয়, এবং তৃতীয় কক্ষায় আর তাহার প্রবেশ
ঘটে না; কাজেই এই গোণীবৃত্তি লক্ষণা নহে। গুণ অর্থ
সাদৃশ্য, একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সাদৃশ্য-সম্বন্ধ
যে পদ-পদার্থ-প্রতিপাদনে প্রতিভাসমান হয় না, কেবলমাত্র
উপম্যাদিপ্রতিপাদনের সময়েই প্রতিভাসমান হইয়া থাকে,
ইহাও অনুভবসিদ্ধ; অতএব, অবশ্য স্বীকার্য্য। সাদৃশ্য-
সম্বন্ধ স্থলে লক্ষণা স্বীকার করিলে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার
লক্ষণার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু উক্ত অলঙ্কারসমূহ
যে ব্যঞ্জনা-বৃত্তিলভ্য, তাহা সকল আলঙ্কারিকই স্বীকার
করিয়াছেন।

'মুখচন্দ্রঃ চূষতি' বলিলে যেমন 'গগনস্থ জ্যোতিষ্কবিশেষ'-
রূপ অর্থ বুঝাইয়া চন্দ্র শব্দের অভিধা, এবং 'চন্দ্রগত
লাবণ্যাди' রূপ অর্থ প্রতিপাদন করিয়া লক্ষণা বিরত হইলে
পর 'চন্দ্রগত-লাবণ্যাদিসদৃশ-লাবণ্যাদিযুক্ত'রূপ সাদৃশ্য-
বোধক অর্থ ব্যঞ্জनावৃত্তির সাহায্যে প্রতিপাদিত হইয়া
উপমালঙ্কার সৃষ্টি করে. 'গৌবাহীকঃ' প্রভৃতি উদাহরণেও
তেমনি সাদৃশ্যবোধক অর্থ ব্যঞ্জनावৃত্তির সাহায্যেই পাওয়া
যাইতেছে। বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে সাদৃশ্য বাচ্য না

হইয়া ব্যঙ্গ্য হওয়ায় উপমালঙ্কারটি ধ্বনিত হইতেছে। ‘কদলী কদলী’ প্রভৃতি স্থলে যেমন দ্বিতীয় কদলী শব্দ ‘কদলীগত জাড্যমান্দ্যাদির আতিশয্যযুক্ত’ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ধ্বনি হইয়াছে বলিয়া মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন, এখানেও তেমনি ‘গোঃ’ পদটি ‘গোসহচরিতজাড্যমান্দ্যাদিতুল্যজাড্যমান্দ্যাদির আতিশয্যযুক্ত’ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ধ্বনি হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের স্বীকার করা উচিত।

মন্মটাচার্য্য যে অব্যঙ্গ্য, গূঢ়ব্যঙ্গ্য এবং অগূঢ়ব্যঙ্গ্যাভেদে লক্ষণাকে পুনরায় বিভক্ত করিয়াছেন, ইহাও আমাদের মনঃপূত হইতেছে না। আমরা চলিতে চাই যে, লক্ষণা কেবল অব্যঙ্গ্যই হইবে। গূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে ধ্বনি এবং অগূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে যে কোন একটি অলঙ্কার হইয়া থাকে—একথা মন্মটভট্টও স্বীকার করিয়াছেন। অগূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে গুণীভূতব্যঙ্গ্য স্বীকার করিয়া ইহার অবাস্তর বিভাগও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, ধ্বনি এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্য ছাড়া গূঢ় ও অগূঢ়ব্যঙ্গ্যের এমন স্থল কোথায় আছে যে, তাহাতে লক্ষণা স্বীকার করিব? ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যঞ্জনারুত্তির সাহায্য ছাড়া পাওয়া যায় না। লক্ষণা নিবৃত্ত হইলেই ব্যঞ্জনার প্রবেশ হইয়া থাকে। অতএব, যে স্থলে ব্যঞ্জনারুত্তির সাহায্যে অর্থবোধ হইতেছে, স্বীকার করিতে হইবে যে, সেখানে অভিপ্রেতার্থ-প্রকাশে লক্ষণার সামর্থ্য নাই। লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনার একত্ৰ

অবস্থিতি যদিও বা সম্ভব হয়, তথাপি, সেই ক্ষেত্রে 'প্রধানেন ব্যপদেশা ভবন্তি'—এই ত্রায় অনুসারে ব্যঙ্গ্যার্থেরই গ্রহণ হইবে, লক্ষিতার্থের নহে। অতএব, কোন অবস্থায়ই ব্যঙ্গ্যার্থস্থলে লক্ষণা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না।

কোন কোন স্থলে লক্ষণা ব্যঙ্গ্যার্থপ্রকাশে সহায়তা করে—স্বীকার করিলেও লক্ষণাকে গূঢ়ব্যঙ্গ্যা বা অগূঢ়ব্যঙ্গ্যা নামে অভিহিত করা চলে না; কারণ, ঐরূপ স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থই প্রধান থাকে। অধিকন্তু, ঐরূপ কারণে ভেদ কল্পনা করিতে হইলে, অভিধার মধ্যেও তাদৃশ ভেদ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু আচার্য্য মন্মট তাহা করেন নাই।

যদিও মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ 'লক্ষণামূল্য-ব্যঞ্জনা' নামে ব্যঞ্জনার একটি পৃথক্ বিভাগ স্বীকার করিয়া লক্ষণাকে ব্যঙ্গ্যার্থ উৎপাদনের অন্তর কারণরূপে কল্পনা করিয়াছেন, তথাপি এই বিষয়েও আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। আমি বলিতে চাই যে, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা পরস্পর নিরপেক্ষভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। উল্লিখিত আচার্য্যগণ তাঁহাদের স্বীকৃত লক্ষণামূল্যব্যঞ্জনাকে অর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্য ও অত্যন্ত-তিরস্কৃতবাচ্যভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আচার্য্য মন্মট অর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্য-লক্ষণামূল-ধ্বনির উদাহরণরূপে—

“ত্বামস্মি বচ্মি বিদ্বাং সমবায়োহত্র তিষ্ঠতি।

আত্মীয়াং মতিমান্স্থায় স্থিতিমত্র বিধেহি তৎ।”

এই শ্লোকটি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, এইস্থলে ‘বচ্‌মি’ পদটি ‘উপদেশ দিতেছি’ অর্থ প্রকাশ করায় এই লক্ষ্যার্থের সাহায্যে উক্তরূপ ধ্বনি হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই শ্লোকে সমগ্র বাক্যের বাচ্যার্থ উপলব্ধির পর ‘বুঝিয়া শুনিয়া চলিবে’, ‘নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে অবহিত থাকিবে’, ‘ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিবে’, ‘পণ্ডিতগণের অবমাননা করিবে না’, এইরূপ যে কোন একটি অর্থ ব্যঞ্জনারূপ্তির সাহায্যে পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহা বাচ্যার্থের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব বহন করিতেছে বলিয়া ধ্বনি হইয়াছে। ‘বচ্‌মি’ পদে বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ যাহাই বুঝায় না কেন, তাহাতে ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের কোন উপকার হইতেছে না। ‘পণ্ডিত-গণ এখানে আছেন’—এই সংবাদের শ্রবণই শ্রোতার সতর্ক হওয়ার হেতু। ইহা সংবাদমাত্ররূপে জানিলেই উল্লিখিত ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ জন্মাইবে। কাজেই, এই ক্ষেত্রে ‘বচ্‌মি’ পদের ‘উপদেশামি’ অর্থ কল্পনা করার কোন প্রয়োজন নাই। ‘বচ্‌মি’ পদটি অভিধাবৃত্তির সাহায্যেই পণ্ডিতগণের উপস্থিতি দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিতে পারে, এবং দিতেছেও বটে। কাজেই, বস্তুতঃ এখানে লক্ষণাই হয় নাই।

আচার্য্য-মন্মথ-প্রদর্শিত অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য-লক্ষণামূল-ধ্বনির উদাহরণ ‘উপকৃতং বহু তত্র—’ ইত্যাদি শ্লোকেও যে বস্তুতঃ লক্ষণার প্রবেশই হয় নাই, তাহা সাহিত্যদর্পণের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রদর্শন করা হইবে।

কাব্যপ্রকাশকার রুঢ়ি-লক্ষণার উদাহরণে যে ‘কর্মণি কুশলঃ’ এই বাক্যটি দিয়াছেন, বস্তুতঃ এইস্থলে লক্ষণাই হয় নাই বলিয়া সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। কুশল শব্দটির ব্যুৎপত্ত্যর্থ প্রসিদ্ধ নহে, তাহার প্রবৃত্তিনিমিত্ত দক্ষরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ, এবং এই অর্থই মুখ্য। কাজেই, উক্ত স্থলে বাচ্যার্থেরই গ্রহণ হইয়াছে; লক্ষ্যার্থের নহে।

রুঢ়ি অর্থ প্রসিদ্ধি। যে শব্দ যে অর্থে রুঢ় বা প্রসিদ্ধ, সেই অর্থটিকে তাহার মুখ্যার্থই মনে করিতে হইবে। অতএব, সকল ক্ষেত্রেই রুঢ়ার্থে লক্ষণা স্বীকার করা আমাদের মতে অযৌক্তিক।

মন্মট ভট্টের উপরোক্ত মতসমূহ খণ্ডনের দ্বারা আচার্য্য জয়দেবেরও অনুরূপ মতসকল খণ্ডিত হইল। ইহা ছাড়া জয়দেব লক্ষণার মধ্যে অন্যান্য যে সকল অবাস্তুরবিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, আমার মতে, তাহা অনাবশ্যক এবং

জয়দেবের মতের সমালোচনা

তাহাদের অনেক স্থলে বস্তুতঃ লক্ষণার অস্তিত্বই নাই। প্রথমতঃ, অতি নগণ্য ভেদ দেখিয়াই যদি লক্ষণাকে বিভক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বিভাগ অসংখ্য হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, জয়দেব অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণার উদাহরণ দেখাইতে গিয়া বস্তুতঃ ব্যঞ্জনার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শব্দ ও অর্থের বৈশিষ্ট্য অনুসারে লক্ষণার দুইটি ভেদের

কথা বলিয়া তিনি ঐগুলির যে সকল উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কি বস্তুতঃ লক্ষণা আছে? জয়দেবের মতে 'রসসমৃদ্ধ কাব্য অমৃত' বলিলে অর্থবৈশিষ্ট্যহেতু লক্ষণা হয়। আমরা কিন্তু দেখিতেছি—অর্থবৈশিষ্ট্যহেতু উক্ত স্থলে রূপকালঙ্কার হইয়াছে। ইহা একটি অর্থালঙ্কার এবং ব্যঞ্জনা-বুদ্ধির সাহায্যেই ইহাকে পাওয়া যায়। উল্লিখিত বাক্যে বস্তুতঃ কাব্য অমৃত অর্থে বা অমৃত কাব্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু কাব্য ও অমৃতের সামান্যাদিকরণ্য হয় না দেখিয়া 'অমৃতের মধ্যে যেমন আনন্দজনকত্ব প্রভৃতি গুণ আছে, রসসমৃদ্ধ কাব্যের মধ্যেও তাহা তেমনি আছে' এইরূপ উপমাগর্ভ অর্থের প্রতীতি হয়। তারপর এই উপমালঙ্কারের সহায়ক উপমান ও উপমেয়রূপ বস্তুদ্বয়কে অভিন্নরূপে কল্পনা করায় "উপমৈব তিরোহিতভেদা রূপক-মুচ্যতে"—এই নিয়ম অনুসারে রূপকালঙ্কাররূপে তাহার গ্রহণ হইল। এই উপমা বা রূপকালঙ্কার বুঝাইবার সামর্থ্য স্বসংযুক্তার্থবোধয়িত্রী লক্ষণার নাই; কাজেই এক্ষেত্রে ব্যঙ্গনারই শরণাপন্ন হইতে হয়। এইরূপে অর্থবৈচিত্র্য থাকিলেই ব্যঙ্গনা হইবে; কাজেই তাদৃশস্থলে লক্ষণা বলা অযৌক্তিক।

শব্দবৈশিষ্ট্যহে তুললক্ষণা হয় সত্য, কিন্তু সর্বত্রই লক্ষণাতে এই শব্দবৈশিষ্ট্য থাকে বলিয়া ইহাকে আর পৃথকভাবে দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। অধিকন্তু, জয়দেব শব্দবৈশিষ্ট্যে

লক্ষণার উদাহরণরূপে 'নিষ্ঠা স্থিরতরং ধনম্'—এই যে বাক্যটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতঃ অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য-রূপকালঙ্কার হইয়া ব্যঞ্জনার্বুত্তিরই অনুকূলে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

সহেতু এবং নির্হেতুভেদে লক্ষণার দুইটি অবাস্তুর বিভাগ দেখাইতে গিয়া জয়দেব যে দুইটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও বস্তুতঃ লক্ষণা না হইয়া ব্যঞ্জনাই হইয়াছে। 'সে সৌন্দর্য্যে কন্দর্প' এবং 'তিনি মূর্ত্তিমতী রতি' এই উভয় স্থলেই 'সিদ্ধহে অধ্যবসায়'রূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে, এবং ইহাও ব্যঞ্জনার্বুত্তির সাহায্যেই পাওয়া যাইতেছে, লক্ষণার সাহায্য নহে।

লক্ষণীয় শব্দের প্রয়োগ ও অপ্রয়োগ দেখিয়া জয়দেব লক্ষণার অপর যে দুইটি বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যথাক্রমে সারোপা ও সাধ্যবসানারই নামান্তর। সিদ্ধ, সাধ্য ও সাধ্যাঙ্গ ভেদে তিনি অপর যে তিনটি অবাস্তুর বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতঃ পার্থক্য এতই অল্প যে, ইহার জ্ঞাত স্বতন্ত্র বিভাগ স্বীকার করা আমাদের বিবেচনায় অনাবশ্যক। প্রয়োজনকে 'ক্ষুট' ও 'অক্ষুট' ভেদে দুই প্রকার কল্পনা করিয়া এবং ইহাদের প্রত্যেকটিকে আবার শব্দনিষ্ঠ ও অর্থনিষ্ঠভেদে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া জয়দেব লক্ষণার যে সকল অবাস্তুর বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা পার্থক্য এতই অল্প দেখিতেছি যে, এই

কারণে পৃথক্ বিভাগ স্বীকারের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। এত অল্প কারণে ভেদ অঙ্গীকার করিলে, ভেদকল্পনার নূতন নূতন হেতু উপস্থিত হইয়া অনন্ত-কল্পনা-গৌরবে পর্য্যবসিত হইবে।

আচার্য্য বিশ্বনাথ রুটি ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মস্মটাচার্য্য যদিও উক্ত কারণে লক্ষণার মধ্যে অবাস্তুর বিভাগ কল্পনা করেন নাই,

তথাপি লক্ষণা উক্ত দুই প্রকারেই হয়—

সাহিত্যদর্পণের

মতের আলোচনা

এই কথাটি তিনিও বলিয়াছেন। আচার্য্য

বিশ্বনাথ মস্মটাচার্য্যের উদাহরণে দোষ দিয়া

নিজে স্বতন্ত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, এইমাত্র বিশেষ।

প্রয়োজনরূপ হেতু অবলম্বন করিয়া যে লক্ষণা হয়, তাহা

আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু রুটিহেতু অবলম্বনে

লক্ষণার স্বীকার বা ভেদকল্পনা আমাদের মতে সম্ভব

নহে। এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বেই হইয়াছে।

সম্প্রতি সাহিত্য-দর্পণোক্ত উদাহরণের আলোচনা করিতেছি।

বিশ্বনাথ বলেন—‘কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ’ বলিলে যখন কলিঙ্গশব্দ কলিঙ্গদেশবাসী পুরুষকে বুঝায়, তখন সেখানে কোন প্রয়োজন না থাকায় রুটিবশতঃই লক্ষণা হইয়া থাকে। ইহা কি ঠিক? হেতু ছাড়া কোন কার্য্য হয় না—দার্শনিকমাত্রেই এই কথা স্বীকার করেন। উক্ত

স্থলে পুরুষটির কলিঙ্গদেশবাসিত্ববোধনরূপ প্রয়োজন আছে বলিলে তাহা কি অসঙ্গত হইবে? আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—কলিঙ্গ শব্দটি প্রসিদ্ধ দেশবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া যে ঐ দেশবাসী পুরুষ অর্থে প্রযুক্ত হইল, তাহার হেতু কি? যদি বলা হয়, সাহসিক শব্দের সহিত অম্বয় না হওয়াই ঐরূপ অর্থবোধনের হেতু, তাহা হইলেও আমরা বলিব—তবে কলিঙ্গশব্দ কলিঙ্গদেশবাসী পুরুষকে না বুঝাইয়া মগধ বা পঞ্চালদেশবাসী পুরুষকে বুঝায় না কেন? বস্তুতঃ, ঐ পুরুষটির কলিঙ্গদেশবাসিত্ব-বোধনরূপ অথবা দেশান্তরবাসিত্বব্যাবর্তনরূপ প্রয়োজন আছে বলিয়াই কলিঙ্গশব্দটি উল্লিখিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কলিঙ্গদেশবাসী পুরুষ যখন কলিঙ্গেই থাকে, এবং অন্ত্র-দেশবাসী লোক হইতে তাহার পার্থক্য বুঝাইবার কোন প্রয়োজন না থাকে, তখন ‘কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ’ এইরূপ বাক্যেরই প্রয়োগ হয় না। রূঢ়িতে উপাদানলক্ষণার উদাহরণে বিশ্বনাথ যে ‘শ্বেতো ধাবতি’ এই বাক্যটি দিয়াছেন, তাহাতেও বস্তুতঃ প্রগাঢ়শ্বেতবর্ণবিশিষ্টত্ববোধনরূপ প্রয়োজন রহিয়াছে। এইভাবে ‘ভারত যুদ্ধে যোগদান করে নাই’ বলিলে ‘যুধ্যমান অন্ত্রাশ্র দেশ হইতে ভারতের পার্থক্য প্রতিপাদন’রূপ প্রয়োজন এখানেও থাকে। এইরূপে অন্ত্রাশ্র স্থানেও লক্ষণা হইলে তাহার হেতুরূপে একটি প্রয়োজন পাওয়া যাইবে। কাজেই আমাদের বিবেচনায় রূঢ়ি

ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণার ভেদস্বীকার কেবল অনাবশ্যকই
নহে, অসঙ্গতও বটে।

আচার্য্য বিশ্বনাথ গূঢ়ব্যাঙ্গ্য ও অগূঢ়ব্যাঙ্গ্য ভেদে
প্রয়োজনগত লক্ষণার যে দুইটি অবাস্তুর বিভাগ কল্পনা
করিয়াছেন, তাহা কাব্য-প্রকাশের আলোচনা প্রসঙ্গেই
খণ্ডিত হইয়াছে। গূঢ়ব্যাঙ্গ্যর উদাহরণে আচার্য্য বিশ্বনাথ,

“উপকৃতং বহু তত্র কিমুচাতে

সুজনতা প্রথিতা ভবতা পরম্।

বিদধদীদৃশমেব সদা সখে !

সুখিতমাসুশ্ব ততঃ শরদাং শতম্ ॥”

এই শ্লোকটি প্রদর্শন করিয়াছেন। লক্ষণ-লক্ষণার উদাহরণ-
রূপেও তিনি এই শ্লোকটি দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ, এই
শ্লোকে লক্ষণা নাই বলিয়া আমরা মনে করি। আচার্য্য
মন্মট কাব্য-প্রকাশের চতুর্থোপাংশে অত্যন্তুতিরস্কৃতবাচ্যধ্বনির
উদাহরণ-রূপে এই শ্লোকটিই প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য
মন্মটাচার্য্যের মতে এইস্থানে লক্ষণামূল্য ব্যঞ্জনা হইয়া ধ্বনির
উৎপত্তি হইয়াছে। বিশ্বনাথও এই স্থানে বিপরীতলক্ষণা
বলিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—‘উপকৃতং
বহু তত্র’ ইত্যাদি শ্লোকে ‘উপকৃত’ প্রভৃতি শব্দ যে অপ-
কারাদি বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত হইল, তাহাতে লক্ষণার
নিয়ামক মুখ্যার্থবাধাদি হেতুত্রয় আছে কি? মুখ্যার্থবাধ
এবং অন্ত্যার্থবোধ আছে সত্য, কিন্তু মুখ্যার্থের সহিত যোগ

কোথায় ? উল্লিখিত দুইটি হেতু তো ব্যঞ্জনাতেও থাকে। মুখ্যার্থের সহিত যোগ না থাকিলে লক্ষণা হয় না বলিয়া মন্মট ও বিশ্বনাথ নিজেরাই যদি আবার ইহার বিপরীতস্থলে লক্ষণা কল্পনা করেন, তবে তাঁহাদের উক্তির সারবত্তা কি ব্যাহত হয় না ? গূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে ধ্বনি এবং অগূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বা অলঙ্কারাদি হয় বলিয়া দর্পণকার নিজেও চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্বীকার করিয়াছেন।

গূঢ়ব্যঙ্গ্যের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—
বাক্যার্থের ভাবনাদ্বারা বাঁহাদের বুদ্ধি পরিপক্ব হইয়াছে, কেবলমাত্র তাদৃশ ব্যক্তিরাই যে ব্যঙ্গ্যার্থ বুঝিতে পারেন, তাহাই গূঢ় (স)। ঈদৃশস্থলে যে গূঢ়ব্যঙ্গ্য হয়, ইহা খুবই সত্য কথা ; কিন্তু এবংবিধ গূঢ়ব্যঙ্গ্যস্থলে লক্ষণা হয় কি প্রকারে ? বাক্যার্থভাবনাপরিপক্ববুদ্ধিবিভবমাত্রবেত্ত অর্থ-মাত্রেই লক্ষণা স্বীকার করিলে ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির স্বীকৃতি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে সমুদয় ধ্বনি, সমুদয় গুণীভূতব্যঙ্গ্য এবং সমুদয় অলঙ্কার লক্ষণারই মধ্যে অনুরূপবিষ্ট হয়।

শাব্দিকগণ বলেন—লক্ষণা হয় পদে, বাক্যে নহে।

(স) ব্যঙ্গ্যস্ত গূঢ়াগূঢ়ত্বাদ্ দ্বিধা স্ত্যঃ ফললক্ষণাঃ ।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কারিকা—১০)

তত্র গূঢ়ো বাক্যার্থভাবনাপরিপক্ববুদ্ধিবিভবমাত্রবেত্তঃ ।

(ঐ ব্যাখ্যা)

বাচ্যার্থবোধের পর লক্ষণার জ্ঞান হয়—এমন নিয়মও করা চলে না; কারণ, ব্যঞ্জনাও বাচ্যার্থবোধের পরেই হইয়া থাকে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই আচার্য্যগণ লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার ভেদ বুঝাইবার জন্য “অন্বয়ানুপপত্তিহি লক্ষণাবীজম্” এই কথাটি বলিয়াছেন। যখন বাক্যস্থিত কোন পদের অন্ত্য পদের সহিত অন্বয় সঙ্গত হয় না, তখন অন্ত্য পদের সহিত সেই পদটিকে অস্থিত করিবার জন্যই লক্ষণা স্বীকার করা হইয়া থাকে। অপর পক্ষে পদসমূহের মধ্যে যখন অন্বয়ের কোন বাধা থাকে না, কেবলমাত্র অবস্থা-পরিণাম-লোচনায় বা কাকু-প্রভৃতি-বশতঃ বাক্য বা বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই স্থলে ব্যঞ্জনা-বৃত্তি স্বীকৃত হয়। ‘উপকৃতং বহু তত্র’ ইত্যাদি শ্লোকে অন্বয়ের কোন বাধা হইতেছে না। কেবলমাত্র কাকুবশতঃ উপকৃতা-বিশেষ বিপরীতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যঙ্গ্যার্থগ্রহণে ঠাহারা অসমর্থ, তাঁহারা কেবলমাত্র মুখ্যার্থেও এই শ্লোকটিকে অনায়াসেই ব্যাখ্যা করিতে পারেন। উপকারীর দীর্ঘজীবন কামনা করা যেমন অসঙ্গত নহে, তেমনি তাহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে উপকারের প্রত্যাশা করাও অনায়াস নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উল্লিখিত শ্লোকে অন্বয়ের অনুপপত্তি হয় নাই; কাজেই লক্ষণাও এই স্থলে স্বীকার করা চলে না। বস্তুতঃ, এইস্থলে ব্যঞ্জনা-ই হইয়াছে, এবং সেই ব্যঞ্জনা-লভ্য অর্থ বাচ্যার্থের চেয়ে

অধিকতর মনোরম বলিয়া এইস্থলে ধ্বনি স্বীকার করাই সমীচীন। এখানে ধ্বনিকে লক্ষণামূলক বলিবারও কোন হেতু নাই; কারণ, 'অশ্বয়ানুপপত্তি'রূপ হেতু না থাকায় উক্ত শ্লোকে বা শ্লোকস্থ পদসমূহে লক্ষণার প্রবেশ হয় নাই।

অগুটব্যঙ্গ্যা লক্ষণার উদাহরণে আচার্য্য বিশ্বনাথ—

‘উপদিশতি কামিনীনাং যৌবনমদ এব ললিতানি।’

এই উদাহরণটি দিয়া বলিয়াছেন যে, এইস্থানে ‘উপদিশতি’ পদ ‘আবিষ্করোতি’ অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় লক্ষণা হইল। তাহার এই যুক্তি আমি মানিয়া লইতে পারি না। যৌবনমদ অচেতন পদার্থ বলিয়া যেমন তাহার উপদেশ দেওয়ার সামর্থ্য নাই, তেমনি আবিষ্কার করারও সামর্থ্য নাই। অতএব বাক্যের মুখ্যার্থচিন্তনের পর ‘যৌবনমদজনিত ললিত কামিনীগণের মধ্যে বিরাজ করিতেছে’ এই অর্থ ব্যঞ্জনাবৃদ্ধির সাহায্যে পাওয়া গেল। কেবলমাত্র ‘উপদিশতি’ পদের যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, ‘যৌবনমদ’ এই কর্তৃপদের সঙ্গে তাহার স্মৃষ্টি অশ্বয় হইবে না; কাজেই অর্থবৈচিত্র্যকে অবলম্বন করিয়াই শব্দবোধ করিতে হইবে। এ স্থলে অশ্বয়ের উপপত্তি হয় নাই, বলা চলে না; কারণ, অচেতন যৌবনমদের মধ্যে চৈতন্তের কল্পনা করিয়া অনায়াসেই অশ্বয়ের উপপত্তি করা যায়। মোট কথা, যে স্থলে অর্থের মধ্যে বৈচিত্র্য

নাই, সেই স্থলেই অম্বয়ের অনুপপত্তি স্বীকার করা হয় ; অর্থবৈচিত্র্য থাকিলে তখন আর অম্বয়ানুপপত্তি স্বীকৃত হয় না। ফলে ধ্বনি, গুণীভূতব্যাঙ্গ্য এবং গুণীভূতব্যাঙ্গ্যহেতু সৃষ্ট অলঙ্কারসমূহে কোথাও লক্ষণা নাই, 'সর্বত্রই ব্যঞ্জন প্রবেশ করিয়াছে—এইরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত। 'উপদিশতি ...' ইত্যাদি শ্লোকেও গুণীভূতব্যাঙ্গ্যই আছে, এবং ইহা ব্যঞ্জনাবৃন্তিলভ্য ; লক্ষণালভ্য নহে।

ফলের ধর্ম্মগতত্ব ও ধর্ম্মগতত্ব কল্পনা করিয়া আচার্য্য বিশ্বনাথ লক্ষণার মধ্যে যে দুইটি অবাস্তুরবিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার মতে অনাবশ্যক। ফল ধর্ম্মগতই হউক বা ধর্ম্মগতই হউক, তাহাতে লক্ষণার কোনরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয় না ; এবং এইরূপ ভেদকল্পনা-দ্বারা লক্ষণার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্যও প্রকট হয় না। এইরূপ সামান্য কারণে ভেদ কল্পনা করিলে ধর্ম্মীর আবার স্ত্রী-পুং-নপুংসকাদিভেদ, তাহার আবার ধীরোদাস্তাদি এবং মুদ্ধামধ্যাদিভেদ, ইহাদের আবার স্বীয়-পরকীয়াদিভেদ, এইরূপ অনন্তকল্পনাগৌরবের হেতু উপজাত হয়। ধর্ম্মের মধ্যেও এইভাবে উৎকর্ষ-অপকর্ষাদি নানারূপ ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, লক্ষণার মধ্যে ইহাদের কোন উপকারিতা নাই দেখিয়া আমরা এইরূপ অবাস্তুরবিভাগ স্বীকার করিতে চাহি না।

পদগত এবং বাক্যগতভেদে আচার্য্য বিশ্বনাথ লক্ষণার

যে দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা তাঁহার সহিত একমত নহি। আমরা এই বিষয়ে নৈয়ায়িকদের সহিত একমত যে, লক্ষণা কেবল পদেই হইতে পারে, বাক্যে নহে। ‘উপকৃতং বহু তত্র—’ইত্যাদি শ্লোকরূপ-বাক্যে যে লক্ষণার প্রবেশ হয় নাই, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি।

আচার্য্য অশ্লয়দীক্ষিত যে গোণী ও শুদ্ধা ভেদে লক্ষণার দুইটি প্রাথমিক বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোণী-স্থলে যে লক্ষণাই হয় না, তাহা উপক্রমণিকাতেই আলোচিত

হইয়াছে এবং কাব্য-প্রকাশের আলোচনা-
অশ্লয়দীক্ষিতের মতের সমালোচনা প্রসঙ্গেও বলা হইয়াছে। অতঃপর তিনি

যে রূঢ়ি ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণার দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে রূঢ়ার্থে যে বস্তুতঃ লক্ষণাই হয় না, তাহাও কাব্যপ্রকাশের আলোচনাপ্রসঙ্গেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আচার্য্য দীক্ষিতের প্রদর্শিত ফলগত সাত প্রকার লক্ষণার মধ্যে জহদজহল্লক্ষণা নামে পৃথক্ লক্ষণা স্বীকার করা আমরা সমীচীন মনে করি না। উক্ত আচার্য্যের মতে, গ্রামের একদেশ দক্ষ হইয়াছে দেখিয়া যখন ‘গ্রামো দক্ষঃ’ অথবা বনের একদেশ পুষ্পিত হইয়াছে দেখিয়া ‘পুষ্পিতং বনম্’ বলা হয়, তখন গ্রামাদি শব্দ একাংশ পরিত্যাগ করিয়া এবং অপরাংশ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থ-প্রতিপা-

দন করে বলিয়া ঐ সকল স্থলে জহদজহল্লক্ষণা হয়। (হ)

আমাদের বিবেচনায় ঐ সকল স্থলে গ্রামাদিশব্দ অভিধাবৃ্ত্তির সাহায্যেই অর্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। গ্রামের একদেশ গ্রামকে ছাড়িয়া নহে; কাজেই, গ্রামশব্দে গ্রামের একদেশ বুঝার পক্ষে কোন বাধা নাই। কোন ব্যক্তির দেহের একাংশে কুষ্ঠব্যাধি হইলে যেমন তাহার দেহ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে—বলা হয়, অথবা বস্ত্রের একাংশ ছিন্ন হইলে বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে—বলা হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি।

অবশিষ্ট ছয়প্রকারের মধ্যে গোণীস্থলে যে আমরা লক্ষণাই স্বীকার করি না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। বাকী পাঁচটিকে তিনি যেমন পরস্পর-নিরপেক্ষ মনে করেন, আমরা সেইরূপ মনে করি না; এই মাত্র প্রভেদ। তাহার স্বীকৃত জহল্লক্ষণা ও অজহল্লক্ষণা বস্তুতঃ লক্ষণ-লক্ষণা ও উপাদানলক্ষণারই নামান্তর। যে স্থলে লক্ষক শব্দ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া অত্বার্থ বুঝায়, সেইস্থলে জহল্লক্ষণা এবং যে স্থলে স্বার্থের সহিত অত্বার্থ বুঝায়, সেই স্থলে অজহল্লক্ষণা হয় বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন নৈয়ায়িকদের গ্রন্থে সাধারণতঃ জহৎস্বার্থা ও অজহৎ-

(হ) গ্রামৈকদেশদাহাদৌ সতি 'গ্রামো দম্বঃ' 'প্লুপ্তিতং বনম্' ইত্যাদি প্রয়োগে গ্রামাদিপদস্ত স্বার্থৈকদেশপরিত্যাগেন তদেকদেশে বৃত্তেজহদজহল্লক্ষণা, দম্বভূয়স্বাদিত্বোতনং ফলম্। [বৃত্তিব্যাপ্তিক]

স্বার্থ নামে যে দুইটি বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে লক্ষণলক্ষণা এবং উপাদানলক্ষণারই নামান্তর। নৈয়ায়িকপ্রবর জগদীশ তর্কালঙ্কার নিরুঢ়া ও আধুনিকীভেদে

অপর যে দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, স্তায়মতের সমালোচনা

তাহা স্বীকার করার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। নিরুঢ়া অর্থ—প্রসিদ্ধা। প্রসিদ্ধ অর্থে যে বস্তুতঃ লক্ষণাই হয় না, তাহা কাব্যপ্রকাশের আলোচনা প্রসঙ্গেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অরুণ শব্দে যখন অরুণবর্ণবিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়, তখন যদি অরুণশব্দের লাক্ষণিক অর্থই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে রুঢ়ি বা নিরুঢ়িরূপ হেতু কল্পনা না করিয়া বরং প্রয়োজনরূপ হেতু কল্পনা করাই সমীচীন। বস্তুতঃ, প্রয়োজন-ব্যতিরেকে লক্ষণাই হয় না; কাজেই, ঐদৃশস্থলে কোনরূপ পৃথক্ বিভাগ স্বীকার করা অনাবশ্যক। জগদীশ তর্কালঙ্কারের প্রদর্শিত আধুনিকী লক্ষণার উদাহরণটি দেখিয়া আমাদের মনে হয়, এই উদাহরণটিই ছুট। 'ইহা ঘট' বলিলে 'ইহা পট' ইত্যাকার জ্ঞান হওয়ার কল্পনা আমাদের বিবেচনায় সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এতাদৃশ জ্ঞান কোথাও হয় বলিয়া আমরা অনুভব করি না। উচ্ছিষ্টপত্র মস্তকে ধারণ করতঃ তাহাকে রাজচ্ছত্ররূপে কল্পনা করিয়া যদি কেহ বলে 'আমি এই দেশের রাজা,' তাহা হইলে, তাহার উক্তি যেমন শুনায়, ঘট শব্দদ্বারা পটপদার্থের প্রতিপাদনের

কল্পনাকেও আমরা সেই পর্যায়েই মনে করি। যাহারা চক্রবাক অর্থে রথাস্ত্রনামন্ শব্দের প্রয়োগটিকে আধুনিকী লক্ষণার উপযুক্ত উদাহরণ মনে করেন, তাঁহাদের সঙ্গেও আমি একমত নহি। আমার বিবেচনায় 'রথাস্ত্রনামন্' শব্দ অভিধাবৃন্তির সাহায্যেই চক্রবাকরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। আমার এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত অভিধানটি প্রদর্শন করিতেছি; যথা —

“কোক*চক্র*চক্রবাকো রথাস্ত্রাহ্বয়-নামকঃ”।

(অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ)

বেদান্ত-পরিভাষা-নামক গ্রন্থে যে ভাবে কেবললক্ষণা ও লক্ষিতলক্ষণা নামে দুইটি বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় তাহা অসঙ্গত। কেবল-লক্ষণা ও

বেদান্তমতের
সমালোচনা

লক্ষিতলক্ষণানামে দুইটি বিভাগ স্বীকার করিতে হইলে, তাহাদিগকে যথাক্রমে উপাদান-লক্ষণা এবং লক্ষণ-লক্ষণার স্থলবর্তী

করাই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। ঐরূপ করিলে বেদান্তপরিভাষায় প্রদর্শিত কেবল-লক্ষণার উদাহরণ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' কথাটি লক্ষিত-লক্ষণার মধ্যে পড়িবে। উক্ত গ্রন্থে লক্ষিতলক্ষণার উদাহরণরূপে প্রদর্শিত দ্বিরেকাদিপদে বস্তুতঃ লক্ষণাই হয় নাই বলিয়া আমরা মনে করি।

“মধুভ্রতো মধুকরো মধুলিগ্ধপালিনঃ ।

দ্বিরেক-পুষ্পলিড্ভঙ্গ-ষট্পদ-ভ্রমরালয়ঃ” ॥

(অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ)

এইরূপ অভিধান দেখিয়া আমি বলিতে চাই যে, দ্বিরেকশব্দ অভিধাবৃত্তির সাহায্যেই ভ্রমর অর্থ বুঝাইয়া থাকে ।

জহল্লক্ষণা এবং অজহল্লক্ষণাও বস্তুতঃ লক্ষণলক্ষণা ও উপাদানলক্ষণারই নামান্তর । জহদজহল্লক্ষণানামে স্বতন্ত্র বিভাগ স্বীকার করা আমার বিবেচনায় অর্থোক্তিক ; কারণ, তাঁহার প্রদর্শিত উদাহরণ ‘কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্’ প্রভৃতিস্থলে কাকশব্দ স্বার্থ পরিত্যাগ না করিয়া স্বার্থের সহিত অন্ত্যর্থ বুঝাইতেছে বলিয়া বস্তুতঃ অজহল্লক্ষণাই হইতেছে । এই সম্বন্ধে অন্ত্যাত্ম আলোচনা অগ্নয়দীক্ষিতের মতের খণ্ডনপ্রসঙ্গে পূর্বেই করা হইয়াছে ।

লক্ষণার প্রকারভেদসম্বন্ধে যে কয়টি প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে, তাহাদের কোনটির সহিতই আমার মতের মিল হইতেছে না দেখিয়া আমার নিজস্ব মত জানিবার জন্য স্বভাবতঃই পাঠক মহোদয়গণের কোতূহল জন্মিবে । অতএব, সম্প্রতি ঐ সম্বন্ধে আমার নিজের মতটি জানাইয়া রাখি ।

প্রথমতঃ, উপাদানলক্ষণা ও লক্ষণলক্ষণাভেদে লক্ষণা দ্বিবিধ । ইহাদের স্বরূপ অন্ত্যাত্ম গ্রন্থকারগণ যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহা আমিও স্বীকার করি । দ্বিতীয়তঃ,

নিম্নবর্ত

উক্ত লক্ষণাদ্বয়ের প্রত্যেকটি আবার সারোপা ও সাধ্যবসানা ভেদে দ্বিবিধ। যে স্থলে বাক্যে বিষয় ও বিষয়ী উভয়েরই প্রয়োগ আছে, সেই স্থলে সারোপা এবং যে স্থলে ইহাদের একটির প্রয়োগ আছে, অপরটির প্রয়োগ নাই, সেইস্থলে সাধ্যবসানা লক্ষণা হইয়া থাকে। মূলতঃ, ইহাদের স্বরূপ এবং উদাহরণ সম্বন্ধেও আমি অন্যান্য গ্রন্থকারদের সহিত একমত। আমার মতে, লক্ষণাতে এই চারিটি মাত্র ভেদ স্বীকার করা উচিত।

মৎপ্রণীত 'কাব্য-প্রভাকরঃ' নামক সংস্কৃতভাষাময় গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত গ্রন্থখানা এযাবৎ মুদ্রিত করা সম্ভব হয় নাই।

উপাদানলক্ষণা ও লক্ষণ-লক্ষণা নামে লক্ষণার যে দুইটি বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যথাক্রমে অজহংস্বার্থা এবং জহংস্বার্থাও বলা হয়। এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। উপাদানলক্ষণা স্থলে অন্যান্য আলোচনা লক্ষক শব্দ নিজের অর্থকে পরিত্যাগ না করিয়া অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়, এই কারণে ইহা স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে না বলিয়া ইহাকে অজহংস্বার্থা লক্ষণা বলে। অপর পক্ষে, লক্ষণলক্ষণায় লক্ষক শব্দ নিজের অর্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থের সহিত যোগবিশিষ্ট অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়; এই কারণে, স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে বলিয়া ইহাকে জহংস্বার্থা

বলা হয়। অজহংস্বাখ্য স্থলে ‘লাঠি যাইতেছে’ বলিলে লাঠিশব্দে লাঠিধারী পুরুষকে বুঝায়, আর জহং-স্বাখ্য স্থলে ‘গঙ্গায় গোয়ালাদের গ্রাম’ বলিলে গঙ্গাশব্দ নিজ অর্থ জলপ্রবাহবিশেষকে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট তীরকে বুঝায়—এই মাত্র প্রভেদ।

লক্ষণ-লক্ষণাশ্বলেও লক্ষকশব্দ নিজের মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাই লক্ষণার বিশেষত্ব। সম্বন্ধ-ব্যতিরিক্ত অর্থ বুঝাইলে তখন লক্ষণা হইবে না; তাদৃশস্থলে ব্যঞ্জনাবৃত্তির সমাগম ঘটিবে। ‘গঙ্গায় গোয়ালাদের গ্রাম’ বলিলে গঙ্গাশব্দে যে তীরকে বুঝায়, তাহার সহিত গঙ্গার সংযোগসম্বন্ধ আছে। এই-ভাবে অন্তরূপ সম্বন্ধ থাকিলেও লক্ষণা হইতে পারে বলিয়া আচার্য্যগণ মনে করেন। সাহিত্যদর্পণে আচার্য্য বিশ্বনাথ বিভিন্ন সম্বন্ধে লক্ষণার কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) রাজার কর্মচারীকে যাইতে দেখিয়া যখন কেহ বলে ‘ঐ রাজা যাইতেছেন’ তখন এই ‘রাজা’পদে স্বস্বামি-ভাব সম্বন্ধে লক্ষণা হয়। (২) হস্তের অগ্রভাগমাত্র দেখাইয়া যখন বলা হয় ‘এই হাত,’ তখন ‘হাত’ পদে অবয়বাবয়বিসম্বন্ধে লক্ষণা, (৩) কর্মকারের কার্য্য করেন, এমন ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া যদি বলা হয় ‘ইনি কর্মকার’, তাহা হইলে ‘কর্মকার’ পদে তাৎকর্ম্যালক্ষণসম্বন্ধে, এবং (৪) ইন্ড্রের উদ্দেশ্যে স্থাপিত স্তূণাসমূহ দেখাইয়া যখন

বলা হয় 'ই' হারা ইন্দ্র', তখন 'ইন্দ্র' পদে তাদর্থ্যলক্ষণসম্বন্ধে লক্ষণা হইয়া থাকে। এই সকল উদাহরণ দেখাইয়া বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, এইরূপে অস্বাভাবিক সম্বন্ধেও লক্ষণা হইতে পারে। বস্তুতঃ, বিশ্বনাথ-প্রদর্শিত উল্লিখিত উদাহরণ-সমূহে লক্ষণা হয় কি না, ইহা বিতর্কের বিষয়।

আমাদের বিবেচনায় বিশ্বনাথ-প্রদর্শিত উল্লিখিত উদাহরণচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমটিতে সাদৃশ্যপ্রতিপাদন-হেতু ব্যঞ্জনা হইয়াছে। রাজার মধ্যে যেমন শাসনকর্ত্ত্ব প্রভৃতি গুণ থাকে, রাজকর্ম্মচারীর মধ্যেও তেমনি তাহা আছে—এই অর্থে উক্তরূপ প্রয়োগ হয়। দ্বিতীয় উদাহরণে অভিধার সাহায্যেই অর্থবোধ হইতেছে। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' প্রভৃতি লক্ষণার উদাহরণে গঙ্গাদি শব্দ স্বার্থ-ব্যতিরিক্ত-তীরাদি অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু হস্তের অগ্রভাগকে হস্ত বলিলে তাদৃশ অস্বার্থে প্রয়োগ হয় না; অতএব উক্ত স্থলে লক্ষণাই হয় নাই। তৃতীয় উদাহরণে তুল্যকর্ম্ম-কর্ত্ত্বরূপ সাধর্ম্ম্য হেতু এবং চতুর্থ উদাহরণে পূজ্যকর্ম্ম-সাধর্ম্ম্য হেতু ব্যঞ্জনা হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

সাধারণতঃ কি কি কারণে লক্ষণা হয়, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বৈয়াকরণগণ বলেন—তাৎস্ম্য, তাদর্ম্ম্য, তৎসামীপ্য, তৎসাহচর্য্য এবং তাদর্থ্য হেতু লক্ষণা হইয়া থাকে (ক্ষ)।

(ক্ষ) তাৎস্ম্যন্তথৈব তাদর্ম্ম্যন্তৎসামীপ্যন্তথৈব চ।

তৎসাহচর্য্যাস্তাদর্থ্যাজ্জ্যেয়া বৈ লক্ষণা বুধৈঃ ॥ (পরমলঘুমঞ্জু বাধৃত)

এইগুলির উদাহরণও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। (১) 'শয্যা হসতি' বলিলে তাৎপৰ্য্যসম্বন্ধবশতঃ শয্যাশব্দে শয্যাস্থিত বালক বা বালিকাকে বুঝায়। (২) 'সিংহো মাগবকঃ' বলিলে তাদ্ধর্ম্যাসম্বন্ধ হেতু সিংহশব্দে 'সিংহের আয় তেজস্বী' অর্থ বুঝায়। (৩) 'বটে গাবঃ' বলিলে সামীপ্যাসম্বন্ধ হেতু বটশব্দে বটগাছের নীচ বুঝায়। (৪) 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' বলিলে তৎসাহচর্য্যাসম্বন্ধ হেতু যষ্টিশব্দে যষ্টিধারী পুরুষকে বুঝায়। (৫) 'অমী ইন্দ্রাঃ' স্থলে তাদর্থ্য-সম্বন্ধ হেতু ইন্দ্রশব্দে স্থগাসমূহকে বুঝায়।

বস্তুতঃ, উল্লিখিত উদাহরণসমূহের মধ্যে—'সিংহো মাগবকঃ' এবং 'অমী ইন্দ্রাঃ' এই দুইটি স্থলে সাদৃশ্য-সম্বন্ধ দ্বারা অর্থের প্রতীতি হওয়ায় আমরা লক্ষণা স্বীকার করা সমীচীন মনে করি না।

আয়ত্বকার মহর্ষি গৌতম দশটি বিভিন্ন সম্বন্ধে লক্ষণার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন (ক)। তিনি বলেন—(১) 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' বলিলে সহচরণরূপ সম্বন্ধ হেতু যষ্টিশব্দে যষ্টিধারী ব্রাহ্মণকে বুঝায়। (২) 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' বলিলে তাৎপৰ্য্যসম্বন্ধ হেতু মঞ্চ শব্দে মঞ্চস্থিত বালককে বুঝায়। (৩) 'বীরণেষ্বাস্তে' বলিলে তাদর্থ্য-সম্বন্ধ হেতু

(ক) সহচরণ-স্থান-তাদর্থ্য-বৃত্ত-মান-ধারণ-সামীপ্য-যোগ-সাধনা-ধিপত্যেভ্যো ব্রাহ্মণ-বাল-কট-রাজ-সক্ত-চন্দন-গন্ধা-শকটান্নপুরুষেষভ্যো-বেহপি তদুপচারঃ। (গৌতমশূত্র ২।২।৬৪)।

কটে বীরণত্বের, (৪) 'অয়ং রাজা যমঃ' বলিলে বৃত্ত-
(স্বভাব) সাদৃশ্যরূপ সম্বন্ধ হেতু রাজ্যতে যমত্বের, (৫)
'প্রস্থঃ সন্তুঃ' বলিলে মান-(পরিমাণ) সম্বন্ধ হেতু সন্তুতে
প্রস্থত্বের, (৬) 'চন্দনং তুলা' বলিলে ধারণসম্বন্ধ হেতু
চন্দনে তুলাত্বের, (৭) 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলিলে সামীপ্য-
সম্বন্ধ হেতু গঙ্গাতে তীরত্বের, (৮) 'কৃষ্ণঃ শকটঃ' বলিলে
কৃষ্ণগুণের সহিত যোগসম্বন্ধ হেতু শকটে কৃষ্ণত্বের, (৯)
'অন্নং প্রাণাঃ' বলিলে প্রাণসাধনরূপ সম্বন্ধ হেতু অন্নে
প্রাণত্বের, এবং (১০) 'অয়ং কুলশ্র রাজা' বলিলে আধি-
পত্য-সাদৃশ্য-রূপ সম্বন্ধ হেতু পুরুষে রাজত্বের আরোপ
হইয়া থাকে (খ)।

(খ) যষ্টিদ্বারোপো ব্রাহ্মণে সাহচর্যাৎ । মঞ্চদ্বারোপো বালেশু,
তাংস্থ্যাৎ । কটেষু বীরণদ্বারোপঃ, তাদর্থ্যাৎ । রাজ্ঞি যমদ্বারোপঃ,
বৃত্তাৎ । সন্তৌ প্রস্থদ্বারোপঃ, তন্মানকত্যাৎ । চন্দনে তুলাদ্বারোপঃ,
তদ্বার্থ্যাৎ । গঙ্গায়াং তীরধর্ম্মাধারদ্বারোপঃ, তৎসামীপ্যাৎ । শকটে
তদ্বর্ষ্মকৃষ্ণদ্বারোপঃ, কৃষ্ণগুণযোগাৎ । অন্নেষু প্রাণদ্বারোপঃ, প্রাণসাধন-
ত্যাৎ । পুরুষে রাজদ্বারোপঃ, কুলাধিপত্য্যাৎ । ইতি তদ্ব্যাখ্যাভারঃ ।

(মঃ মঃ দুর্গাপ্রসাদকৃত সাহিত্যদর্পণটিপ্পনী)

দ্রষ্টব্য— মঃ মঃ ফণিভূষণতর্কবাগীশ-সম্পাদিত গ্রন্থ অনুসারে
উক্ত শ্রায়সূত্রের সংখ্যা—২২।৬২, এবং সূত্রে বাল শব্দ স্থলে
মঞ্চ শব্দ ও শকটশব্দস্থলে শাটক শব্দ পঠিত হইয়াছে। মঃ মঃ
দুর্গাপ্রসাদের প্রদর্শিত পাঠটি অধিকতর সম্মত মনে করিয়া আমরা

উল্লিখিত উদাহরণসমূহের মধ্যে ‘অয়ং রাজা যমঃ’ এবং ‘অয়ং কুলস্ত রাজা’ এই দুইটি উদাহরণে সাদৃশ্যসম্বন্ধ হেতু ব্যঞ্জনার প্রবেশ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

উল্লিখিত তাৎপর্য প্রভৃতি বা গৌতম-সম্মত সহচরণ প্রভৃতি যে সকল হেতু দেখান হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্ততঃ লক্ষণা হইতে পারে বলিয়া আচার্য্যগণ মনে করেন। মোট কথা, ‘স্বসংযুক্ত অপরার্থ বুঝাইলেই লক্ষণা হইবে’ এই স্থলে সংযুক্ত শব্দটির ‘যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত’ এইরূপ অর্থ আচার্য্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও বলিতে চাই যে, লক্ষণার প্রতিবন্ধক হেতু না থাকিলে বাধিত মুখ্যার্থের সহিত যে কোন প্রকার সাঙ্গাৎ সম্বন্ধ থাকিলেই লক্ষণা হইবে।

আচার্য্য জয়দেব বলেন— আভিমুখ্য প্রভৃতি কয়েকটি কারণে লক্ষণা হইয়া থাকে ; যথা—

“আভিমুখ্যাৎ সন্নিধানান্তথাকারপ্রতীতিতঃ।

কার্য্যকারণভাবাচ্চ বাচ্যবাচ্যকভাবতঃ ॥

ইত্যেবমাদিসম্বন্ধাৎ কিঞ্চান্তস্মাচ্চতুষ্টিয়াৎ।

সাদৃশ্যাৎ সমবায়াৎ সা বৈপরীত্যাৎ ক্রিয়াস্বয়াৎ ॥”

তাহাই প্রদর্শন করিলাম। বাৎস্তায়ন ভাষ্যে উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা কোন কোন স্থলে কিছু কিছু আপত্তিজনক বিবেচিত হওয়ায় তাহা প্রদর্শন না করিয়া যঃ যঃ দুর্গাপ্রসাদপ্রদর্শিত ব্যাখ্যাই প্রদর্শন করিলাম।

আভিযুখ্যসম্বন্ধে, যথা—‘অঙ্গুল্যাগ্রে করিশতম্’। সন্নিধান-
সম্বন্ধে—‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’।

কারিকাস্থিত ‘আকার-প্রতীতি’ কথাটির তাৎপর্য
‘রাকাগম’ নামক টীকার রচয়িতা গাগাভট্ট বুদ্ধিতে পারেন
নাই বলিয়া মনে হয়। তিনি ইহার কোন উদাহরণ
না দিয়া লিখিয়াছেন—

“একত্র বাস্তবোহপরত্র ভ্রান্তিবিষয়ঃ। অত্র হেতুমাহ—
তথাকারেতি। সান্নিধ্যাকারপ্রতীতিতঃ ইতার্থঃ।”

বস্তুতঃ ‘আকারপ্রতীতি’ একটি পৃথক্ হেতু।
ইহার উদাহরণ, যথা—ভীমের মত বিশালকায় লোক
দেখিয়া ‘ভীম আসিতেছে’ বলিলে ভীমশব্দে লক্ষণা।
এই ভাবে, ‘হাতীর মত বিশাল’ অর্থে ‘এ যে একটা হাতী’
বলিলে হাতী শব্দে আকার-প্রতীতি হেতু লক্ষণা হয়—
ইহাই কারিকাকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়; কারণ,
আভিযুখ্য বা সন্নিধানরূপ হেতুর বিশেষণরূপে ‘আকার-
প্রতীতি’ শব্দের প্রয়োগ করার কোন যৌক্তিকতা দেখা
যায় না। উক্ত দুইটি স্থানে বাস্তব ও অবাস্তব ভেদেই
হউক, বা অন্য যে কোন ভাবেই হউক, কোনরূপ উল্লেখ-
যোগ্য আকার-প্রতীতি আছে বলিয়া আমরা অনুভব
করি না। এতাদৃশ আকার-প্রতীতি গোণীলক্ষণারই একটি
প্রকারবিশেষ। আমরা যে ঈদৃশস্থলে লক্ষণা স্বীকার
করি না, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

কার্য্যাকারণভাব দ্বিবিধ। 'ঘৃতমাযুঃ' বলিলে ঘৃতশব্দের লক্ষ্য আযুঃ পদে কার্য্যত্বসম্বন্ধে এবং 'আযুর্ঘৃতম্' বলিলে আযুঃপদলক্ষ্য ঘৃতে কারণত্বসম্বন্ধে লক্ষণা হয় বলিয়া জয়দেব মনে করেন।

বাচ্যবাচকভাবও দুই প্রকার। দ্বিরেক শব্দের অর্থ ভ্রমর। 'দ্বিরেকমুচ্চারয়তি' বলিলে দ্বিরেক পদ যৌগিকার্থ দ্বারা ভ্রমরকে বুঝায়। এই ক্ষেত্রে ভ্রমরের সহিত দ্বিরেকশব্দের বাচ্যত্ব-সম্বন্ধ। আবার 'ঘটমুচ্চারয়তি' বলিলে ঘটপদে বাচকতাসম্বন্ধে লক্ষণা হয় বলিয়া আচার্য্যগণ মনে করেন। কারিকায় আদি শব্দ গ্রহণ করিয়া আচার্য্য জানাইয়াছেন যে, এতদ্ব্যতিরিক্ত-সম্বন্ধেও লক্ষণা হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় দ্বিরেক প্রভৃতি শব্দে যে লক্ষণাই হয় না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

জয়দেবের মতের মধ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পৃথগ্ভাবে পুনরায় লক্ষণার অষ্ট চারিটি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—সাদৃশ্য, সমবায়, বৈপরীত্য এবং ক্রিয়াস্বয়। সাদৃশ্যে—গৌর্বাহীকঃ। সমবায়—ছত্রিণো গচ্ছন্তি। বৈপরীত্যে—অকুশলকে কুশল বলা। ক্রিয়াস্বয়ে—যুধিষ্ঠিরো রাজা।

বস্তুতঃ, সাদৃশ্যস্থলে যে লক্ষণা হয় না, বৈচিত্র্যাহেতু ব্যঞ্জনার প্রবেশ এবং তাহার ফলে অর্থালঙ্কারের উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি'

এই উদাহরণেও সমবায়রূপ হেতু স্বীকারের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বস্তুতঃ, এই ক্ষেত্রেও ছত্রধারীর সাহচর্য্যহেতুই ছত্রিন্ শব্দে ছত্রহীনকেও বুঝাইয়াছে।

বৈপরীত্যসম্বন্ধস্থলে মুখ্যার্থের সহিত যোগ না থাকায় যে লক্ষণাই হয় না, বরং ব্যঞ্জনার প্রবেশ ঘটে, তাহাও আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। ‘যুধিষ্ঠিরো রাজা’—এই উদাহরণেও ‘যুধিষ্ঠিরের মত ধান্মিক’ অর্থে যুধিষ্ঠির শব্দের গ্রহণ হইয়াছে; কাজেই এই ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকায় রূপক বা উপমালঙ্কারের প্রবেশ ঘটিয়াছে। অতএব, অর্থবোধ লক্ষণার সাহায্য না হইয়া ব্যঞ্জনার সাহায্য হইল। বৈচিত্র্যস্বীকার না করিলেও তাৎক্ষণ্যসম্বন্ধদ্বারা লক্ষণার সিদ্ধি হইতে পারে; কাজেই ক্রিয়াস্বরূপে পৃথক্ হেতু স্বীকার করা অনাবশ্যক।

লক্ষণার হেতু সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে, কোন শব্দ-দ্বারা স্বসংযুক্তার্থের প্রকাশ হইলে, মুখ্যার্থের সহিত তাহার যে কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিলেই লক্ষণা হইবে; কিন্তু স্বসংযুক্তার্থের প্রকাশ না হইলে লক্ষণা হইবে না। লক্ষণা-স্থলে অবয়ানুপপত্তিরূপ হেতু থাকা একান্ত আবশ্যক। ঐ হেতু না থাকিলে সম্বন্ধ থাকিলেও লক্ষণা হইবে না। তাৎক্ষ্য প্রভৃতি অথবা আভিযুখ্য ইত্যাদি কতকগুলি হেতু দিক্‌প্রদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু

সাদৃশ্য প্রভৃতি স্থলে স্বসংযুক্তার্থের প্রকাশ না হওয়ায় এবং অদ্বয়ানুপপত্তিরূপ মূল হেতু না থাকায় লক্ষণা হইবে না।

কেবলমাত্র শব্দেই লক্ষ্যার্থ গ্রহীত হয়, বাক্যে নহে; ইহাই সাধারণ অভিমত। কিন্তু মীমাংসকগণ বাক্যেও লক্ষ্যার্থ গ্রহীত হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অন্তেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িকগণ মীমাংসকদের এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

মীমাংসকেরা বলেন—‘গভীরায়ানং নদ্যাং ঘোষঃ’ এই বাক্যে বাক্যার্থপ্রতিপাদনের পরই লক্ষণার প্রবেশ হইয়াছে; অতএব, এই স্থলে লক্ষণা বাক্যগত। তাঁহারা বলেন
 মীমাংসক ও নৈয়ায়িক মতের পার্থক্য —নদীপদে তীর লক্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলে গভীরা-শব্দের সহিত তাহার সামানাধিকরণ্য হয় না; কারণ, তীর গভীর নহে। অতএব, পদগত-লক্ষণাস্বীকারে অদ্বয়ের উপপত্তি হয় না বলিয়াই উক্তস্থলে বাক্যগত লক্ষণা স্বীকার্য।

নৈয়ায়িকেরা বলেন—উক্তস্থলে নদীপদই লক্ষ্যার্থ-দ্বারা গভীর নদীর তীরকে বুঝাইতেছে। তাহার বিশেষণ গভীর শব্দটি তাৎপর্য্যমাত্রগ্রাহক। কাজেই, লক্ষণা পদগতই হইল; বাক্যগত নহে। তাঁহাদের মতে ‘গভীরায়ানং’ পদেও গভীরনদীতীর অর্থে লক্ষণা স্বীকার করা যাইতে পারে। তখন নদীপদটি তাৎপর্য্যগ্রাহক হইবে। গভীরনদীর তীর,

প্রতিপাদনই উক্ত তাৎপর্যাগ্রহণের হেতু (গ)।

আলঙ্কারিকদের মধ্যেও বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ লক্ষণার বাক্যগতত্বও স্বীকার করিয়াছেন। বৈয়াকরণগণও সমাসে শক্তি স্বীকার করিয়াছেন; এবং সমাসের বাক্যত্বও স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং 'চিত্রগুঃ' প্রভৃতি সমস্তপদের অর্থ-প্রতিপাদনের জন্য স্বীকার করিতে হয় যে, বৈয়াকরণগণও বাক্যে লক্ষণার স্বীকর্তা। আমরা যে লক্ষণার কেবল পদগতত্বই স্বীকার করি, বাক্যগতত্ব স্বীকার করি না, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(গ) বাক্যে তু শব্দেরভাবাচ্ছক্যসদ্ব্যবস্থা লক্ষণাপি নাস্তি। যত্র 'গভীরায়ঃ নত্যাং ঘোষঃ' ইত্যুক্তং তত্র নদীপদস্ত নদীতীরে লক্ষণা। গভীরপদার্থস্ত নত্যা সহাভেদেনাঘ্রয়ঃ কচিদেকদেশাঘ্রয়স্তাপি স্বীকৃতত্বাৎ। যদি তত্রৈকদেশাঘ্রয়োহপি ন স্বীক্রিয়তে, তদা নদীপদস্ত গভীরনদীতীরে লক্ষণা, গভীরপদং তাৎপর্যাগ্রাহকম্। (সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী)

ব্যঞ্জনা

ব্যঞ্জনা = বি-অন্জ্ + ল্যু + টাপ্ ॥ অন্জ্, ধাতুর নানা অর্থ (ক) থাকিলেও এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রকাশ অর্থেই তাহার গ্রহণ হইয়াছে। অতএব, ব্যুৎপত্তি-অনুসারে বিশেষ-ভাবে প্রকাশেরই নাম ব্যঞ্জনা; অর্থাৎ ব্যঞ্জনাশব্দে অর্থ-প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়।

কোন শব্দ শুনিবামাত্র প্রথমেই শ্রোতার অন্তরে তাহার বাচ্যার্থের স্মরণ হয়। বাক্য উচ্চারণে যখন দেখা যায়, কোন শব্দের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে বাক্যের অর্থ সঙ্গত হইতেছে না, তখন সঙ্গত অর্থ উপলব্ধির জন্য সেই শব্দটির লক্ষণাবিহিত অর্থের স্মরণ হয়। যখন লক্ষণাও অভিপ্রেতার্থ-প্রকাশে অক্ষম হয়, তখনই ব্যঞ্জনাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহার নাম ব্যঙ্গ্যার্থ। ব্যঙ্গ্যার্থ কেবল শব্দেই থাকে না, বাক্যে এবং কখন কখন বাক্যার্থেও অবস্থান করিয়া সে বাক্যের ও অর্থের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

আচার্য্যগণ বলেন—‘অভিধা প্রভৃতি বিরত হইলে পর যে বৃত্তির সাহায্যে অপর অর্থ

ব্যঞ্জনার লক্ষণ

(ক) অনুজ্জ্ব ব্যক্তি-ব্রক্ষণ-কাস্তি-গতিষু।

প্রতিপাদিত হয়, শব্দ ও অর্থ প্রভৃতির সেই বৃত্তির নামই ব্যঙ্গনা ” (খ)

ব্যক্তি = বি-অন্জ্ + ক্তিন্ (ভাবে) ॥ ব্যঙ্গনা ও ব্যক্তি শব্দের একই অর্থ। এই কারণেই ব্যঙ্গনা অনেক সময় ব্যক্তি নামেও অভিহিত হয়।

‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ (গঙ্গায় গোয়ালাদের গ্রাম) বলিলে গঙ্গাশব্দদ্বারা জলপ্রবাহরূপ অর্থ বুঝাইয়া অভিধা এবং গঙ্গাতীররূপ অর্থ বুঝাইয়া লক্ষণা বিরত হইলে পর স্থানের শীতলতা, পবিত্রতা প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য ব্যঙ্গনাবৃত্তি কার্য্য করিয়া থাকে; অর্থাৎ উল্লিখিত বাক্যদ্বারা যখন বক্তা ‘গোয়ালাদের বসতিস্থল পবিত্র এবং শীতলজলবায়ুসমৃদ্ধ’ এই অর্থটুকু বুঝাইতে চান, এবং শ্রোতাও উহা উপলব্ধি করেন, তখন এতাদৃশ অর্থ বুঝাইবার সামর্থ্য অভিধা ও লক্ষণার না থাকায় ব্যঙ্গনাবৃত্তির সাহায্যে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধনই প্রথম ব্যঙ্গনাবৃত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া ধ্বনিপ্রস্থানের প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ধ্বন্যালোক নামক গ্রন্থে

(খ) বিরতাস্বভিধান্ন যস্যার্থো বোধ্যতেঃপরঃ।

সা বৃত্তির্ব্যঙ্গনা নাম শব্দস্বার্থাদিকশ্চ চ।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

আনন্দবর্দ্ধনের মত বাচ্য ও প্রতীয়মান ভেদে অর্থের দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন (গ)। আনন্দবর্দ্ধনের মতে এই বাচ্যার্থ উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে (ঘ)। অভিধাপকরণে আমরা যে বাচ্যার্থের আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে আনন্দবর্দ্ধন-সম্মত এই বাচ্যার্থ ভিন্ন। ইহাকেই মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা গুণীভূতব্যঙ্গ্য নামে অভিহিত করিয়াছেন।

প্রতীয়মান নামক অপর অর্থটিকে আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন অঙ্গনাদেহস্থ লাভণ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। লাভণ্য যেমন দেহের অবয়বাদি হইতে অতিরিক্ত একটি বিশেষ ধর্ম, এই প্রতীয়মানার্থও তেমনি উপমাদি অলঙ্কার বা অঙ্গান্ন বাক্যাবয়বাদি হইতে ভিন্ন (ঙ)। এই প্রতীয়মানার্থকেই তিনি ধ্বনি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(গ) অর্থঃ সহৃদয়প্লাব্যঃ কাব্যাত্মা যো ব্যবস্থিতঃ।

বাচ্য-প্রতীয়মানার্থো তত্ত্ব ভেদাবুভৌ স্বভৌ ॥

(ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত)

(ঘ) তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো যঃ প্রকারৈরুপমাদিভিঃ।

বহুধা ব্যাকৃতঃ সোহন্তোঃ কাব্যলক্ষ-বিধায়িভিঃ ॥

(ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত)

(ঙ) প্রতীয়মানঃ পুনরন্তদেব বস্তুন্তি বাণীষ্ মহাকবীনাম্।

যন্তঃপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তঃ বিভাতি লাভণ্যমিবাঙ্গনাম্ ॥

(ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত)

আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন কারিকায় লাবণ্য শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন এবং টীকাকার অভিনবগুপ্ত এই লাবণ্য শব্দের অর্থও বুঝাইয়া দিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত লিখিয়াছেন—

অভিনব গুপ্ত “অবয়বসংস্থানের দ্বারা প্রকাশমান অবয়ব-
ব্যতিরিক্ত ধর্ম্মবিশেষের নামই লাবণ্য।

অবয়বসমূহের নির্দোষতা বা অলঙ্কারযুক্ততা লাবণ্য নহে” (চ)। একটি প্রাচীন শ্লোকেও লাবণ্যের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়—মুক্তার মধ্যে কাহারও প্রতিকৃতি দেখিলে উহাতে যেমন চাকচিক্য দেখা যায়, দেহস্থিত তাদৃশ চাকচিক্যের নামই লাবণ্য (ছ)।

আনন্দবর্দ্ধন-প্রদর্শিত উক্ত প্রতীয়মান নামক অর্থটিকে পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ ধ্বনি নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

মন্মট ও বিশ্বনাথ মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরা গুণীভূতব্যাঙ্গ্যের আটটি প্রকারভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধন-প্রদর্শিত ধ্বনির তিনটি মৌলিক ভেদও (বস্তু, অলঙ্কার এবং রস) তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধ্বনির মধ্যে আনন্দবর্দ্ধন অপর যে কয়েকটি

(চ) লাবণ্যং হি নামাবয়বসংস্থানাভিব্যাপ্যমবয়বব্যতিরিক্তং ধর্ম্মা-
স্তরমেব। ন চাবয়বানামেব নির্দোষতা বা ভূষণযোগো বা লাবণ্যম্।
(লোচন)

(ছ) মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্মমিবাস্তরা।

প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।

বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই সন্দেহ না হইয়া তাঁহারা অধিকতর সূক্ষ্মভাবে ধ্বনির অবাস্তুর-বিভাগ বিশ্লেষণে যত্নবান্ হইয়াছেন। এইভাবে মন্মটভট্টের মতে ধ্বনির মধ্যে মোট ১০৪৫৫টি (শরেষুযুগখেন্দবঃ) বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার ইহাদিগকে কিছু কমাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারও মতে ধ্বনির ভেদ মোট ৫৩৫৫টি (ইষুবাণাগ্নিসায়কাঃ)।

নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি কোন কোন বৈয়াকরণও ব্যঞ্জনার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ইহার লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আচার্য্য নাগেশ বলেন—মুখ্যার্থ বাধিত নাগেশভট্টের মত

হউক বা না হউক, মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক; প্রসিদ্ধই হউক বা অপ্রসিদ্ধই হউক, যে বাচ্যাদি-ব্যতিরিক্ত অর্থ বক্তা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যহেতু উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহার উদ্বোধক সংস্কারবিশেষের নামই ব্যঞ্জনা (জ)।

আচার্য্য নাগেশের নামে প্রচলিত ‘পরমলঘুমঞ্জুষা’ নামক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণের মত খণ্ডন করিয়া ব্যঞ্জনা-স্বীকারের অনুকূলে যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, নৈয়ায়িকেরা যে লক্ষণার সাহায্যেই

(জ) মুখ্যার্থবাধগ্রহণিরপেক্ষবোধজনকে। মুখ্যার্থসম্বন্ধাসম্বন্ধসাধারণপ্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধার্থবিষয়কে। বক্তাদিবৈশিষ্ট্যজ্ঞানপ্রতিভাদ্বাদ্ব্যুৎসংস্কারবিশেষে। ব্যঞ্জনা।

(লঘুমঞ্জুষা)

ব্যঞ্জনালভ্য অর্থের জ্ঞান হয় বলিয়া ব্যঞ্জনাবৃত্তি অস্বীকার করিতে চাহেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, লক্ষণাস্থলে মুখ্যার্থের বাধপূর্বক মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থের উপলব্ধি হয়, কিন্তু ব্যঞ্জনাস্থলে তাদৃশ অর্থবোধ হয় না; অতএব ব্যঞ্জনা লক্ষণার অন্তর্ভুক্ত নহে (ব)।

রসাত্মক বাক্যে যে রসের বোধ হয়, তাহা অভিধা বা লক্ষণার সাহায্যে হইতে পারে না; কারণ, শব্দের সন্ধেতিতার্থমাত্র বুঝাইয়াই অভিধা এবং সন্ধেতিতার্থের সহিত সংযুক্ত অর্থমাত্র বুঝাইয়াই লক্ষণা বিরত হইয়া থাকে। এই দুইটি বৃত্তির কোনটির সাহায্যেই রসের প্রতীতি হয় না; অথচ রসের যে প্রতীতি হয়, একথা সকলেই স্বীকার ও অনুভব করিয়া থাকেন। শব্দের যে বৃত্তির (function) সাহায্যে রসের প্রতীতি হয়, তাহা তাৎপর্যও নহে; কারণ, রসজ্ঞান বিভিন্ন পদার্থের অস্বয়মাত্রনিষ্পাদ্য নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অভিধা, লক্ষণা এবং তাৎপর্য ছাড়াও আর একটি বৃত্তি আছে, এবং তাহাকে গ্রহণ না করিলে রস, অলঙ্কার, ধ্বনি প্রভৃতির মত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহেরও উপলব্ধি হয় না। এই বৃত্তিকেই আচার্য্যেরা

(ব) যন্তু তাকিকাঃ লক্ষণ্যৈব গতার্থা ব্যঞ্জেতি ন সা স্বীকা-
 র্যোত্যাহঃ। তন্ন। লক্ষণায়া মুখ্যার্থবাধপূর্বকলক্ষ্যার্থবোধকত্বাৎ,
 মুখ্যার্থসম্বন্ধার্থশ্চৈব লক্ষণায়া বোধকত্বাৎ, ব্যঞ্জনায়া অতথাৎ
 তদনন্তর্ভাবাচ্ছেতি দিক্। (পরমলঘুমঞ্জুবা)

ব্যঞ্জনা বলিয়া থাকেন। এই ব্যঞ্জনারূপিত্তি পূর্বোক্ত বৃত্তিদ্বয়ের চেয়ে অধিকতর মনোরম এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন অন্তের বোধগম্য নহে। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া ধ্বনি, গুণীভূতব্যাঙ্গ্য এবং অলঙ্কারসমূহ অবস্থান করে। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহাই প্রকৃতপক্ষে কাব্যের বা সাহিত্যের প্রাণ। আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন—অভিধা, লক্ষণা এবং তাৎপর্য্য নামক বৃত্তিত্রয়ের বিশ্রান্তির পর রসাদি বোধের জন্ম আর একটি চতুর্থবৃত্তি স্বীকার করা আবশ্যক (ঞ)। এই চতুর্থ-বৃত্তি কথাটিদ্বারা তিনি ব্যঞ্জনার কথাই বলিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন—বলবান্ ব্যক্তিকর্তৃক নিষ্কিণ্ড শর যেমন একাই শত্রুর বর্ষ্মচ্ছেদ, বক্ষোভেদ এবং প্রাণহরণরূপ ত্রিবিধ কার্য্য সম্পাদন করে, তেমনি এক অভিধাবৃত্তিই বিভিন্নপ্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে—এইরূপ বলিলেই

ব্যঞ্জনার বিপক্ষে
বৃত্তি তো চলিতে পারে; তাহার জন্ম নিরর্থক
ব্যঞ্জনারূপিত্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি? আবার

ধনিক প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলেন—তাৎপর্য্য-
বৃত্তির সাহায্যেই ধ্বনি প্রভৃতির গ্রহণ হইয়া থাকে; কারণ,
তাৎপর্য্যের জন্ম এমন কোন সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নাই

(ঞ) বৃত্তীনাং বিশ্রান্তেরভিধা-তাৎপর্য্য-লক্ষণাখ্যানাম্।

অঙ্গীকার্য্য তুর্য্য্য বৃত্তিবোধে রসাদীনাম্॥

(সাহিত্যদর্পণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, কারিকা—১)

যে, সে কোন নির্দিষ্ট অর্থ বুঝাইয়াই ক্ষান্ত হইবে (ট)।
এইরূপে উল্লিখিত শেযোক্ত আচার্য্যগণও ব্যঙ্গনাবৃ্ত্তির
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না।

বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ দৃঢ়তার সহিত বলেন যে,
উল্লিখিত মতদ্বয়ের কোনটিই বিচারসহ নহে। নিজেদের
অনুকূলে যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইতে গিয়া তাঁহারা বলেন—
“শব্দ বুদ্ধি এবং কৰ্ম্ম একবার মাত্র কার্য্য করিয়াই বিরত
হয়” এইরূপ যে একটি স্মৃতি আছে, তাহাকেই এই বিষয়ে
প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অভিধা তাহার
সামর্থ্য অনুসারে একটিমাত্র অর্থ বুঝাইয়া
বিরুদ্ধমত-খণ্ডন
ক্ষান্ত হইলে সে পুনরায় প্রবৃত্ত হইবে না।
তাৎপর্য্যের বেলাও এই নিয়ম। অতএব, ধ্বনি, অলঙ্কার
প্রভৃতি বুঝিবার জন্য অশ্রু একটি বৃ্ত্তির স্বীকৃতি ভিন্ন
গত্যন্তর নাই (ঠ)।

(ট) যচ্চ কেচিদাহঃ — ‘সোহয়মিষোরিষ দীর্ঘ-দীর্ঘতরোহভিধা-
বাপারঃ’ ইতি। যচ্চ ধনিকেনোক্তম্—“তাৎপর্য্যাব্যতিরেকাচ্চ ব্যঙ্গকণ্ঠশ্চ
ন ধ্বনিঃ। যাবৎকার্য্যপ্রসারিত্বাৎ তাৎপর্য্যং ন তুলায়তম্” ॥ ইতি।
তয়োরূপরি শব্দবুদ্ধিকৰ্ম্মণাং বিরম্য ব্যাপারাবাব ইতি বাদিভিরেব
পাতনীয়ো দণ্ডঃ। (সাহিত্যদৰ্পণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

(ঠ) “শব্দবুদ্ধিকৰ্ম্মণাং বিরম্য ব্যাপারাবাব” ইতি নয়েনাভিধা-
লক্ষণা-তাৎপর্য্যাত্ম্যাস্থ তিস্থ্ বৃ্ত্তিষ্ স্বংস্বমর্থং বোধয়িত্বোপক্ষীণাস্থ
যযাত্তোহর্থো বোধ্যতে, সা শব্দস্তার্থস্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদেশ

বলবান্ ব্যক্তিকর্তৃক নিষ্কিণ্ণ শর যে শত্রুর বর্শচ্ছেদ, বক্ষোভেদ এবং প্রাণহরণরূপ কার্য্যসমূহ সম্পাদন করে, তাহা বস্তুতঃ একটি কার্য্য নহে। বর্শচ্ছেদরূপ কার্য্য করিয়া এই কার্য্যের জন্ত সে চিরতরে বিরত হয়। তারপর, বক্ষোভেদও একবারই করিয়া থাকে। এইরূপে প্রাণহরণরূপ কার্য্যও একটিই বটে। যদিও অতিবলশালী ব্যক্তিকর্তৃক নিষ্কিণ্ণ শাণিত শর অথবা শক্তিশালী বন্দুকের বুলেট একাধিক ব্যক্তির বিনাশসাধনেও সমর্থ, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে তাহার ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্নই হইয়া থাকে। অভিধা প্রভৃতি বৃত্তি বা বুদ্ধির বেলা কিছুতেই একের একাধিক কার্য্য সমর্থন করা চলে না। একই শর একসঙ্গে একত্র স্থাপিত শত শত পদ্মপত্র ভেদ করিতেছে বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও বস্তুতঃ একটি বিদ্ধ করার পরই সে অপরটি বিদ্ধ করিয়া থাকে; সুতরাং এক্ষেত্রেও ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে। একজন লোক যখন তাহার টেবিলের উপর স্থাপিত দোয়াত, কলম, পুস্তক প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু অবলোকন করে, তখনও বস্তুতঃ এক একটি করিয়াই তাহার ঐ সকল বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। রসাদি-প্রতীতির বেলা যে

শক্তিব্যঞ্জন-ধ্বনন-গমন-প্রত্যায়নাদি-ব্যপদেশবিষয়া ব্যঞ্জন নাম।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

অভিধা-তাৎপর্য্য-লক্ষণাত্মক-ব্যাপারজয়াতিবর্তী ধ্বননাদিপর্ধ্যায়ো
ব্যাপারোহনপহুবনীয় এব। (কাব্যপ্রকাশ, পঞ্চম উল্লাস)

সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞান হয়, তাহাও বস্তুতঃ একই বটে। এইরূপে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অভিধা প্রভৃতি যে কোন একটা বৃত্তিদ্বারা একাধিক কার্য সম্পাদনের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে যুক্তি ও প্রমাণবিরুদ্ধ।

অধিকন্তু, যদি স্বীকার করা হয় যে, এক অভিধা বা তাৎপর্যানায়ী বৃত্তি বক্তার ইচ্ছানুযায়ী যতগুলি খুসী অর্থ বুঝাইবে, তাহা হইলেও অনবস্থা দোষের বিষয় উপজাত হয়। বক্তা যাহা খুসী বলিতে চাহিলে কি যে কোন প্রকার শব্দবিন্যাসদ্বারাই তাহা বুঝাইতে পারেন? আর শ্রোতার কি সেইভাবেই তাহা গ্রহণ করেন? মনে করুন—একজন লোক ‘রাম বনে গিয়াছিলেন’ এই বাক্যের অর্থ বুঝাইবার জন্য ‘গরু ঘাস খাইতেছে’ এইরূপ একটি বাক্য বলিলেন। যদি অভিধা বা তাৎপর্যকে যাবৎকার্য-প্রসারী বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বক্তার ইচ্ছানুযায়ী উল্লিখিত বাক্যের উপরোক্ত অর্থই শ্রোতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। হতভাগ্য শ্রোতা কি করিয়া বুঝিবেন যে, বক্তৃপ্রবর উল্লিখিতরূপ অর্থেই বাক্যটি প্রয়োগ করিয়াছেন? এই সকল কথা পর্যালোচনা করিয়াই মনীষিগণ নিয়ম করিয়াছেন যে, একটি বৃত্তি কোন শব্দের একবার একটিমাত্র অর্থ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়, এবং তখন সেই বৃত্তি আর প্রযুক্ত হয় না। এই নিয়মের ফলে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন শব্দ বা যে কোন বাক্যদ্বারা

যাহা খুসী এবং যতগুলি খুসী অর্থ বুঝাইতে পারেন না।
তাঁহাকে নিয়মের বশত স্বীকার করিয়া চলিতে হয়।

বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের পার্থক্য সাধারণ-
ভাবে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বাচ্যার্থ
অভিধা ও ব্যঙ্গনার
পার্থক্য হইতে ব্যঙ্গ্যার্থকে পৃথক্ ভাবে বুঝিবার
কতকগুলি হেতু আচার্য্য বিশ্বনাথ সাহিত্য-
দর্পণের পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রদর্শন করিয়াছেন (ড)।
সাহিত্যদর্পণের মতানুযায়ী উল্লিখিত হেতুসমূহ নিম্নে
প্রদর্শিত হইল।

(১) বোদ্ধভেদ—একই বাক্যের মধ্যে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ
দুইটিই থাকে বটে, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ সকলের বোধগম্য হয়
না। পদ এবং পদার্থের জ্ঞানবিশিষ্ট একজন শ্রুতবুদ্ধি লোকও
যে কোন বাক্যের বাচ্যার্থ বুঝিয়া থাকে, কিন্তু চিন্তাশীল
সহৃদয় ভিন্ন অন্য কেহ ব্যঙ্গ্যার্থের উপলব্ধি করিতে পারে
না। অতএব, এইরূপ জ্ঞাতার ভেদ হইতে বাচ্যার্থ ও
ব্যঙ্গ্যার্থের পার্থক্য বুঝা যায়।

(২) স্বরূপভেদ—ব্যঙ্গ্যার্থ সর্বত্র একপ্রকার হয় না।
“ওহে পথিক, আজ তুমি এখানে নির্ভয়ে ভ্রমণ কর; কারণ,
গোদাবরীতীরবাসী হৃদাস্ত সিংহটি আসিয়া আজ সেই
কুকুরটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে।” এই বাক্যে ‘ভ্রমণ কর’

(৩) বোদ্ধ-স্বরূপ-সংখ্যা-নিমিত্ত-কার্য-প্রতীতি-কালানাম্।

আশ্রয়-বিষয়াদীনাং ভেদাদ্ ভিন্নোহভিধেয়তো ব্যঙ্গ্যঃ ॥

এই বিধিবাক্যটি ব্যঞ্জনারূপের সাহায্যে 'ভ্রমণ করিও না' এইরূপ নিষেধের প্রতীতি জন্মাইল; আবার, "ওরে খোকা, তোর হাত, পা, জামা, কাপড় সব কিছুতেই যে কাদা দেখছি। তা হ'লে আজ তুই নিশ্চয়ই খেলার মাঠে যাস্ নি।" এই বাক্যে 'যাস্ নি' এই নিষেধাত্মক কথাটি 'গিয়াছিলি' এইরূপ বিধিবাক্যের অর্থ বুঝাইল। এইরূপে ব্যঙ্গ্যার্থের স্বরূপগত ভেদ দেখিয়াও তাহার অস্তিত্ব এবং বাচ্যার্থ হইতে তাহার পার্থক্য বুঝা যায়।

(৩) সংখ্যাভেদ—বাচ্যার্থ একটি বাক্যে মাত্র একটিই থাকে; কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ একটি বাক্যে অনেকগুলিই থাকিতে পারে। 'সূর্য্য অস্ত গমন করিয়াছেন'—এই বাক্যের বাচ্যার্থ মাত্র একটি; কিন্তু এই বাক্যটি শুনিয়া বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ্যার্থ গ্রহণ করিতে পারে। অভিসারিকার নিকট ইহা 'অভিসারে চল', রাখালের নিকট 'গরু লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও', নায়কের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা নায়িকার নিকট 'নায়কের আসিবার সময় হইয়াছে', চোরের নিকট 'চুরি করিতে চল', এইরূপে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। এইরূপ সংখ্যাভেদ দেখিয়াও বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের পার্থক্য অবগত হওয়া যায়।

(৪) নিমিত্তভেদ—বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের বোধে নিমিত্তও সম্পূর্ণ পৃথক্। শব্দের উচ্চারণমাত্রই বাচ্যার্থের প্রতীতি

হয় ; কিন্তু প্রতিভানৈর্মল্য না থাকিলে ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ হয় না ।

(৫) কার্য্যভেদ—অভিধার কার্য্য প্রতীতি-উৎপাদন, আর ব্যঞ্জনার কার্য্য চমৎকারিতা-সম্পাদন । কাজেই, উভয়ের মধ্যে কার্য্যভেদও প্রকট ।

(৬) প্রতীতিভেদ—বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ উভয়ের প্রতীতির মধ্যেও আবার পার্থক্য বিদ্যমান । বাচ্যার্থের প্রতীতি কেবলমাত্র অভিধানাদি-প্রসিদ্ধ মুখ্যার্থমাত্রে পর্য্যবসিত ; কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি চমৎকারিতা-সংযোগ-সংবলিত ।

(৭) কালভেদ—বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি একই সময়ে হয় না । প্রথমে বাচ্যার্থের বোধ হয়, তাহার পর ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে । উভয়ের প্রতীতির মধ্যে এইরূপ পূর্বপশ্চাত্তাব থাকিয়াও উভয়ের পার্থক্য প্রতিপাদন করিতেছে ।

(৮) আশ্রয়ভেদ—বাচ্যার্থ কেবলমাত্র শব্দকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থের আশ্রয় নানাপ্রকার । ব্যঙ্গ্যার্থ কখনও শব্দে, কখনও অর্থে, কখনও শব্দের একাংশে, কখনও বর্ণে, কখনও বা বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অভিধেয়ার্থ হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করে ।

(৯) বিষয়ভেদ—বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে বিষয়ভেদও পরিষ্কার দেখা যায় ।

“কশ্চ বা ন ভবতি রোষঃ পশ্চতঃ প্রিয়ায়াঃ সত্রণমধরম্ ।
সত্রমরপদ্মাত্রায়িণি বারিতবামে সহস্বেদানীম্ ॥”

(প্রিয়ার অধরে ক্ষত দেখিলে কাহার না ক্রোধ হয় ?
তুমি যখন ভ্রমরযুক্ত পদ্মের আশ্রাণ লও, তখনই আমি বারণ
করিয়াছিলাম । এখন সহ্য কর ।) এই শ্লোকটি যদিও
পতিকর্তৃক ভৎসিতা রমণীর নিকট তাহার সখী বলিতেছে,
তথাপি পতি ও পত্নী প্রত্যেকের নিকট ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ
প্রতীত হইতেছে । ইহার বাচ্যার্থের উদ্দেশ্যস্থল উক্ত রমণী ;
‘ভ্রমরই উহার অধরে ক্ষত করিয়াছে, অন্য পুরুষ নহে’ এই
ব্যঙ্গ্যার্থের উদ্দেশ্য—তাহার পতি । ব্যঙ্গ্যার্থটি রমণী
ও তাহার পতি উভয়েরই বোধগম্য হইতে পারে বলিয়া
এইস্থলে বোদ্ধ-ভেদ স্বীকার করা চলে না ।

লক্ষ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের পার্থক্যও আচার্য্যগণ বুঝাইয়া
লক্ষণা ও ব্যঙ্গনার দিয়াছেন । লক্ষণাতে ‘মুখ্যার্থের বাধ’,
পার্থক্য ‘মুখ্যার্থের সহিত যোগ’ এবং ‘অন্তার্থ-
প্রতীতি’ এই তিনটি হেতু থাকা আবশ্যক ;
কিন্তু ব্যঙ্গনাতে এইরূপ কোন নিয়ম নাই । মুখ্যার্থ বাধিত
না হইলে লক্ষণার প্রবেশ হয় না ; কিন্তু ব্যঙ্গনা মুখ্যার্থবাধ
ছাড়াও হইতে পারে । লক্ষণার বেলা যেমন ‘অম্বরানুপপত্তি’
বা ‘তাৎপর্যানুপপত্তি’ থাকা একান্ত আবশ্যক, ব্যঙ্গনার
বেলা তাহা নহে ।

কেহ কেহ বলেন, ‘গঙ্গায় গোয়ালাদের গ্রাম’ বলিলে

গঙ্গাশব্দে যে শীতত্ব-পাবনত্বাদির প্রতীতি হয়, তাহা লক্ষণার সাহায্যে হইয়া থাকে বলিলেই বা ক্ষতি কি? কারণ, গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থ জলপ্রবাহ বাধিত হওয়ার পর সে যেমন লক্ষণার সাহায্যে তীরকে বুঝায়, তেমনি শীতত্বপাবনত্বাদি-বিশিষ্ট তীরকে বুঝাইলেই বা দোষ কি? ইহার উত্তরে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, লক্ষণাদ্বারা কেবলমাত্র মুখ্যার্থের সহিত যুক্ত অন্ত্যর্থই বুঝা যায়; এতদতিরিক্ত অর্থ বুঝা যায় না; এই কারণে লক্ষণাকে অভিধাপুচ্ছভূতা বলা হয়। যদি লক্ষণাতে ইহার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তদতিরিক্ত আরও কিছু, তারপর ইহা ছাড়া আরও কিছু—এইভাবে অনন্ত অর্থ প্রতিপাদনে তাহার প্রয়োগের বিষয় উপজাত হইয়া অনবস্থা দোষ ঘটিবে। (ঢ)

ইহা ছাড়া প্রয়োজন-সংবলিত লক্ষণীয় অর্থের স্বীকৃতি অন্ত্যর্থ দিয়াও যুক্তিবিগর্হিত বটে। লক্ষণীয় অর্থ জ্ঞানের বিষয়, আর প্রয়োজন তাহার ফল। এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট। জ্ঞানলাভের পরেই ফললাভ হইয়া থাকে।

(ঢ) এবমপ্যনবস্থা শ্রাদ্ যা মূলক্ষতিকারিণী।

(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয় উল্লাস)

যদি চ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদৌ প্রয়োজনং লক্ষ্যং শ্রাৎ, তীরস্ত মুখ্যার্থঃ বাধিতঃ চ শ্রাৎ, তত্শাপি চ লক্ষ্যতয়া প্রয়োজনাস্তরং তত্শাপি প্রয়োজনাস্তরমিত্যনবস্থাপাতঃ।

(সাহিত্যদর্পণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

শীতল-পাবনত্বাদি ফল বুঝাইবার জন্যই গঙ্গাশব্দ তীর অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; এমতাবস্থায় উল্লিখিত প্রয়োজন-বিশিষ্ট তীরে লক্ষণা হইয়াছে বলা কি যুক্তিবিগর্হিত নহে ? অন্য একটি দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা আরও পরিষ্কার করিতেছি । ‘দশরথ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন’—এই বাক্যে যেমন যজ্ঞ সম্পন্ন হইলেই পুত্রলাভ হইয়া থাকে, তাহার পূর্বে নহে ; পূর্বোক্ত উদাহরণেও তেমনি । গঙ্গাশব্দদ্বারা তীর অর্থের প্রতীতি হওয়ার পরই তীরস্থিত শীতল-পাবনত্বাদির বোধ হয় ; তাহার পূর্বে নহে । ইহা বুঝাইবার জন্য আচার্য্য মন্মট—

“প্রয়োজনেন সহিতং লক্ষণীয়ং ন যুজ্যতে ।

জ্ঞানস্য বিষয়ো হ্যন্যঃ ফলমন্যদুদাহৃতম্॥”

(কাব্যপ্রকাশ, ২য় উল্লাস)

এই কারিকাটি দিয়া ‘প্রত্যক্ষাদেহি নীলাদিবিষয়ঃ, ফলন্ত প্রকটতা সংবিত্তির্বা,’ ইত্যাদি উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন । অভিপ্রায় এই যে, ‘নীল ঘট’ বলিতে যদিও ঘটের গাঢ় নীলবর্ণ বুঝাইবার জন্য, অথবা শ্বেতপীতাদি অন্য ঘট হইতে তাহাকে পৃথক্ভাবে জানাইয়া দিবার জন্য ‘নীল’ শব্দের প্রয়োগ হয়, তথাপি এই বাক্য শুনিয়া শ্রোতা যখন ঘটের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন সে নীলবর্ণকেই প্রত্যক্ষ করে । নীলবর্ণের উপলব্ধির পর বর্ণের প্রগাঢ়তার বা শ্বেতপীতাতি ঘট হইতে নীল ঘটের পার্থক্যের প্রতীতি

হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় 'নীলবর্ণ', এবং ভাষার প্রয়োগের ফল 'প্রকটতা' অথবা 'সংবিত্তি'। 'নীল বর্ণ' বলিতে নীলশব্দের নীলবর্ণ-বিশিষ্টে লক্ষণা হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকটতাদিজ্ঞান এই সময়ে হয় নাই; লক্ষ্যার্থজ্ঞানের পরেই হইয়াছে। গঙ্গাশব্দও এইভাবে লক্ষণাদ্বারা তীরমাত্র অর্থ বুঝাইয়া বিরত হইলেই শীতত্বাদি বুঝাইবার জন্য ব্যঞ্জনার প্রবেশ ঘটিয়া থাকে। (গ)

নৈয়ায়িকগণ ব্যঞ্জনারূপিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না।

তঁাহাদের মতে ব্যঙ্গ্য রসাদির জ্ঞান অনু-
নৈয়ায়িক মত মানের সাহায্যে হইয়া থাকে। তঁাহারা

বলেন—ধূমরূপ হেতু দেখিয়া যেমন পর্বতস্থিত বহির অনুমান হয়, তেমনি মুখ্যার্থরূপ হেতু দেখিয়া ব্যঙ্গ্যার্থেরও অনুমান হইয়া থাকে। আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ সুন্দর যুক্তিদ্বারা নৈয়ায়িকদের এই মত খণ্ডন

নৈয়ায়িক-মতের

খণ্ডন

করিয়াছেন। তঁাহারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে; ব্যঙ্গ্যার্থনির্ণয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান নাই, আর ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকিলে যে অনুমান হয় না, তাহা তো নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করিয়াছেন। ব্যাপ্তিজ্ঞান বলিতে

(গ) 'ন চাপি প্রয়োজনবিশিষ্ট এব তীরে লক্ষণা। বিষয়-প্রয়োজনয়োৰ্গপৎপ্রতীত্যানভ্যপগমাৎ। নীলাদিসংবেদনানন্তরমেব হি জ্ঞাততায়্য অনুব্যবসায়স্ত বা সম্ভবঃ'।

(সাহিত্যদর্পণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

এই বুঝায় যে, যেখানেই হেতু থাকিবে, সেখানেই হেতু-মানের জ্ঞান হইবে। ধূমরূপ হেতু দেখিলেই বহিরূপ হেতুমানের অনুমান হইয়া থাকে ; কারণ ধূম থাকিলে বহি থাকিবেই। ব্যঙ্গ্যার্থের বেলা তো এই নিয়ম চলে না। বাচ্যার্থদ্বারা যদি ব্যঙ্গ্যার্থের অনুমান হইত, তবে যেখানেই বাচ্যার্থ থাকিত, সেখানেই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইত ; কিন্তু তাহা তো হয় না। এমন বহু বাক্য আছে, যাহাতে কেবল বাচ্যার্থই দেখা যায়, 'ব্যঙ্গ্যার্থের গন্ধও পাওয়া যায় না। কাজেই ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকায়, 'বাচ্যার্থদ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের অনুমান হয়'—এ কথা বলা চলে না।

এতদ্ব্যতীত নৈয়ায়িকেরা অনুমানের লক্ষণ করিতে গিয়া বলেন—“পক্ষসত্ত্ব-সপক্ষসত্ত্ব-বিপক্ষব্যাবৃত্ত্ববিশিষ্টাল্লিঙ্গাল্লিঙ্গিনো জ্ঞানমনুমানম্” অর্থাৎ অনুমানের ব্যাপারে যে হেতু দেখিয়া হেতুমানের জ্ঞান হয়, সেই হেতু এমন হওয়া আবশ্যিক, যাহা পক্ষ পৰ্ব্বতাদিতে অবশ্যই থাকিবে, সপক্ষ মহানসাদিতেও থাকিতে পারে, কিন্তু বিপক্ষ জলহ্রদাদিতে কিছুতেই থাকিবে না। ব্যঙ্গ্যার্থ-নির্ণয়ে বাক্যকে পক্ষরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে বাচ্যার্থ থাকিলেই ব্যঙ্গ্যার্থ থাকিবে, এই নিয়ম অচল। অপরপক্ষে পৰ্ব্বতের সপক্ষ মহানসাদিতে যেমন ধূমরূপ হেতু দেখা যায়, ব্যঙ্গ্যার্থের বেলা এইরূপ বাচ্যার্থযুক্ত কোন সপক্ষই পাওয়া যায় না ; কারণ, একমাত্র বাক্যান্তর্গত পদ ভিন্ন আর

কোথাও বাচ্যার্থ থাকে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, নৈয়ায়িক-সম্মত পক্ষসম্বাদি হেতুত্রয়ের সব কয়টিই ব্যঙ্গ্যার্থ নির্ণয়ে পাওয়া না যাওয়ায়, এই কারণেও ব্যঙ্গ্যার্থের জ্ঞান অনুমান-সহায়ে হয়, বলা চলে না।

তাহা ছাড়া, যদিও বা বাচ্যার্থকে ব্যঙ্গ্যার্থ-নির্ণয়ের হেতুরূপে কল্পনা করা যায়, তথাপি তাহা বস্তুতঃ হেতু না হইয়া হেত্বাভাসই হইবে। যখন কোন হেতু নিঃসন্দেহে সাধ্যনির্ণয়ে সহায়তা করে, একমাত্র তখনই সে হেতুপদবাচ্য; কিন্তু যাহা নিঃসন্দেহে সাধ্যজ্ঞান জন্মাইতে পারে না, তাহাকে হেত্বাভাস বলা হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ এই হেত্বাভাসকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—(১) অনৈকান্ত, (২) বিরুদ্ধ (৩) অসিদ্ধ, (৪) সংপ্রতিপক্ষ, এবং (৫) কালাত্যাযোপদিষ্ট। মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, বাচ্যার্থকে ব্যঙ্গ্যার্থের হেতুরূপে কল্পনা করিলে বস্তুতঃ উহা হেত্বাভাসে পরিণত হয়, এবং তাহাতে হেত্বাভাসের পাঁচ প্রকার দোষের মধ্যে অন্ততঃ তিন প্রকার দোষই পাওয়া যায়। উদাহরণের সাহায্যে তাঁহারা ইহা পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছেন, যথা :—

(১) অনৈকান্ত—“হে পথিক, আজ তুমি এখানে নির্ভয়ে ভ্রমণ কর” ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্যে ‘ভ্রমণ কর’ এই বিধিটিকে ‘ভ্রমণ করিও না’ এইরূপ নিষেধসূচক অর্থে

গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি দেখান হয় যে, কুকুরের ভয়ে যে ব্যক্তি ভ্রমণ করিতে সাহস পাইত না, সে নিশ্চয়ই কাপুরুষ ; সিংহের উপস্থিতির সংবাদ শুনিলে সেই কাপুরুষ কিছুতেই আর এখানে থাকিবে না । কিন্তু, এই যুক্তি সর্বত্র খাটে না ; কারণ, এমনও দেখা যায়--কোন কোন সময়ে ভীরা ব্যক্তিও গুরুজন বা প্রভুর নির্দেশে, অথবা প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগবশতঃ ভয়ের কারণকেও অগ্রাহ্য করিয়া থাকে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, উক্ত বিধিসূচক বাক্যটিকে যেমন নিষেধসূচক অর্থে প্রয়োগ করার পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়, তেমনি তাহাকে বিধিসূচক অর্থে প্রয়োগ করার পক্ষেও যুক্তির অভাব হয় না । কাজেই, হেতু উভয়নিষ্ঠ হইয়া পড়িল । এইরূপ হেতু নিঃসন্দেহে সাধ্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ বলিয়া তাহাকে হেত্বাভাস, এবং এতাদৃশ হেত্বাভাস অনেকনিষ্ঠ বলিয়া তাহাকে অনৈকান্ত হেত্বাভাস বলা হয় । অনৈকান্ত হেত্বাভাস তিন প্রকার—(১) সাধারণ, (২) অসাধারণ, এবং (৩) অনুপসংহারী । উক্ত বাক্যে হেতু উভয়নিষ্ঠ হওয়ায় সাধারণ অনৈকান্ত হইয়াছে । (ত)

(২) বিরুদ্ধ—উক্ত বাক্যে “কুকুরের মৃত্যুসংবাদে সঙ্গ সঙ্গ সিংহের উপস্থিতির সংবাদ জানাইবার ফলেই বুঝা যায় যে, কুকুরের ভয়েই যে এখানে ভ্রমণ করিতে সাহস

(ত) যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেৎ সাধারণস্ত সঃ ।

(ভাষাণরিচ্ছেদ)

পাইত না, সিংহের উপস্থিতি-সংবাদ শুনিলে নিশ্চয়ই সে ভ্রমণ করিবে না; অতএব ‘ভ্রমণ কর’ এই বিধিবাক্যটি নিষেধাত্মক অর্থে প্রযুক্ত হইল”—এইরূপ কল্পনা নিঃসন্দেহে করা চলে না। এমন বীরব্যক্তিও দেখা যায়, ঘাঁহার। নগণ্য প্রাণী হিসাবে কুকুরকে ভয় করেন বটে; কিন্তু সিংহ প্রভৃতি বলশালী জন্তুর সম্মুখীন হইতে ভয় পান না। অতএব, সিংহের উপস্থিতি-সংবাদ যেমন ভ্রমণ-নিষেধের অনুকূল বলা যাইতে পারে, তেমনি তাহাকে ভ্রমণের অনুকূল মনে করাও তো অসঙ্গত নহে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সিংহসদৃশরূপ হেতুটিকে ব্যঙ্গ্যার্থের অনুকূলে না লাগাইয়া বাচ্যার্থের অনুকূলেও লাগাইতে পারেন। এইভাবে যখন বাচ্যার্থের অনুকূলে হেতুটিকে লাগান হয়, তখন তাহাকে আর ব্যঙ্গ্যার্থের অনুকূলে পাওয়া যায় না। অতএব, ইহা বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস। (খ)

(৩) অসিদ্ধ—উল্লিখিত বিধিবাক্যে যে নিষেধাত্মক ব্যঙ্গ্যার্থ পাওয়া গেল, তাহার হেতু—গোদাবরীতীরে সিংহসদৃশ। কিন্তু, গোদাবরী-তীরে যে সিংহ থাকে, তাহা কেহ দেখে নাই, অথবা অনুমানের সাহায্যেও জানিতে পারে নাই। কেবলমাত্র বক্তার কথা শুনিয়া ইহা জানা যাইতেছে। কিন্তু, এইরূপ বক্তার বাক্যটিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কাজেই বাচ্যার্থ

(খ) যঃ সাধ্যবতি নৈবাস্তি স বিরুদ্ধ উদাহৃতঃ। (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

‘গোদাবরীতীরে সিংহের অবস্থিতি’ কথাটিই প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। অতএব, এই ক্ষেত্রে ব্যঙ্গার্থ-নির্ণয়-ব্যাপারে বাচ্যার্থরূপ হেতুর অসিদ্ধতাও পরিস্ফুট। অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকার, যথা—(১) আশ্রয়াসিদ্ধি, (২) স্বরূপাসিদ্ধি, এবং (৩) বাচ্যতাসিদ্ধি। এইস্থলে বাচ্যার্থেরই অসিদ্ধি হওয়ায় বাচ্যতাসিদ্ধি নামক অসিদ্ধ-হেত্বাভাস হইল। (দ)

(দ) তথাহি—“অনুমানং নাম পক্ষসত্ত্ব-সপক্ষসত্ত্ব-বিপক্ষ-ব্যাবৃত্তত্ব-বিশিষ্টাল্লিঙ্গাল্লিঙ্গিনো জ্ঞানম্। ততশ্চ বাচ্যাদনং বন্ধোহর্থস্তাবয় প্রতী-
য়তে। অগুণ্যতিপ্রসঙ্গঃ স্ত্রাং। ইতি বোধ্যবোধকরোরর্থয়োঃ কশ্চিৎ
সম্বন্ধোহস্ত্যেব। ততশ্চ বোধকোহর্থো লিঙ্গম্, বোধ্যশ্চ লিঙ্গী, বোধকস্ত
চার্ষস্ত পক্ষসত্ত্বং নিবন্ধমেব। সপক্ষসত্ত্ব-বিপক্ষব্যাবৃত্তত্বে অনিবন্ধে
অপি সামর্থ্যাদবসেয়ে। তস্মাদত্র যদ বাচ্যার্থাল্লিঙ্গরূপাল্লিঙ্গিনো ব্যঙ্গ্যা-
র্থস্তাবগমস্তদনুমান এব পর্য্যবস্তুতি” ইতি। তন্ন; তথাহত্র “ভম
ধস্মিঅ...। ইত্যাদৌ গৃহে স্থনিবৃত্ত্যা বিহিতং ভ্রমণং গোদাবরীতীরে
সিংহোপলন্ধেরভ্রমণমনুমাণয়তি” ইতি যদ্বক্তব্যস্তত্রানৈকান্তিকো হেতুঃ।
ভীরোরপি গুরোঃ প্রভোৰ্কা নিদেশেন প্রিয়ানুরাগেণ বা গমনস্ত
সম্ভবাৎ। পুংশ্চল্যা বচনং প্রামাণিকং ন বেতি সন্দ্বিদ্ধাসিদ্ধশ্চ।

(সাহিত্যদৰ্পণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

“ভীরুরপি গুরোঃ প্রভোৰ্কা নিদেশেন প্রিয়ানুরাগেণ অগ্নেন
চৈবজ্বতেন হেতুনা সত্যপি ভয়কারেণ ভ্রমতীত্যনৈকান্তিকো হেতুঃ।
গুনো বিভ্যদপি বীরত্বেন সিংহান্ন বিভেতীতি বিক্কদ্ধোহপি। গোদাবরী-
তীরে সিংহসম্ভাবঃ প্রত্যক্ষাদনুমানাদ বা ন নিশ্চিতঃ, অপি তু বচনাৎ;

ব্যঙ্গ্যার্থের হেতুরূপে নৈয়ায়িকগণকর্তৃক কল্পিত ব্যাচ্যার্থের হেতুতায় উক্তরূপ ত্রিবিধ হেত্বাভাস স্থাপন করিয়া আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ দেখাইয়াছেন যে, নৈয়ায়িকদের উক্ত কল্পনা অসঙ্গত। বস্তুতঃ, ব্যাচ্যার্থদ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের অনুমান হয় না। ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যাচ্যার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

যাঁহারা ব্যঙ্গ্য রসের উৎপত্তির কারণরূপে বিভাব, অনুভাব, এবং সঞ্চারিভাবকে কল্পনা করিয়াছেন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, রসের সঙ্গে উহাদের কার্য্য-অভিনবগুপ্তের মত কারণভাবই নাই। রত্যাদিস্থায়িভাবই

রসরূপে পরিণত হয়, এবং বিভাবাদির সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানই রত্যাদি-স্থায়িভাবরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। বিভাবাদির জ্ঞান যখন একে একে হইতে থাকে, তখনই তাহারা বিভাবাদিপদবাচ্য; আর যখন তাহাদের সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞান হয়, তখন তাহাদিগকে রস সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি যে কোন কার্য্যই করে না, তাহা নহে; তবে তাহারা রসের হেতু হয় না। রস স্বয়ংপ্রকাশ, তাহার প্রকাশে অন্য হেতুর প্রয়োজন থাকে না। সে অন্য জ্ঞানেরও

ন চ বচনশ্চ প্রামাণ্যমন্তি অর্থেনাপ্রতিবন্ধাদিত্যসিদ্ধশ্চ। তৎ কথমেবং-বিধাদ্ধেতোঃ সাধ্যসিদ্ধিঃ”।

(কাব্যপ্রকাশ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

অপেক্ষা রাখে না (বেদান্তরসম্পর্কশূন্য)। রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে বিভাবাদির কার্য্য এই যে, তাহারা সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়স্থিত চিদ্ঘন আনন্দপারাবারের অজ্ঞানরূপ আবরণ উন্মোচন করিয়া দেয়। ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর অথগু আনন্দ-চিন্ময় রসরূপ আনন্দসমুদ্র তখন প্রকাশের বাধা অপনোদিত হওয়ায় স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। (ধ)

(ধ) “বিভাবৈর্লনেনোত্তানাভিভিরালম্বনোদীপনকারণৈ রত্যাদিকো ভাবো জনিতঃ, অল্পভাবৈঃ কটাক্ষভূজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কাৰ্ধৈঃ প্রভীতিযোগ্যঃ ক্রুতঃ ব্যভিচারিভিনির্বেদাদিভিঃ সহকারিভিরূপচিত্তো মুখ্যা বৃত্ত্যা রামাদাবলুকার্ধো তদ্রূপতালুম্বান্নান্নর্ভকেহপি প্রতীয়মানো রস ইতি ভট্টলোল্লটপ্রভৃত্যঃ”। — কাব্যপ্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস।

“লোকে প্রমদাদিভিঃ স্থায়ালুমনেহভ্যাসপাটববতাং কাব্যে নাট্যে চ তৈরেব কারণাদিভিঃ কারণত্বাদিপরিহারেণ বিভাবনাদিব্যাপার-বন্ধাদলৌকিকবিভাবাদিশব্দব্যবহার্ধ্যৈঃ মমৈবৈতে, তটস্থত্বৈবৈতে, ন মমৈবৈতে, ন শত্রোরৈবৈতে, ন তটস্থত্বৈবৈতে ইতি সহৃদবিশেষ-স্বাকার-পরিহারনিয়মান্যবসায়ং সাধারণেন . প্রতীতৈরভিব্যক্তঃ সামাজিকানাং বাসনাস্ততয়া স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিঃ নিয়তপ্রমাতৃগতত্বেন স্থিতোহপি সাধারণোপায়বলাং তৎকালবিগলিত-পরিমিতপ্রমাতৃ-ভাববশোন্নিষিতবেদান্তরসম্পর্কশূন্যপরিমিতভাবেন প্রমাত্রা সকলসহৃদয়-সংবাদভাজা সাধারণেন স্বাকার ইবাভিন্নোহপি গোচরীকৃতচর্ক্যমাণ-তৈকপ্রাণো বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ পানকরসন্ত্রায়েন চর্ক্যমাণঃ পুর ইব পরিস্কুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্বাদীণমিবাভিহন্ অত্রং সর্কমিব তিরোদধদ্ ব্রহ্মাস্বাদমিবাভ্যবসন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারা-

যাঁহারা বলেন, বিভাবাদির সংস্কারজন্য-জ্ঞান বা স্মৃতিই
 রস, তাঁহাদের মতও মন্সটভট্ট প্রভৃতি
 বিভাবাদির স্মৃতিই আচার্য্যগণ খণ্ডন করিয়াছেন। যদি রসা-
 রস নহে

স্বাদের সময়ে বিভাব প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্
 স্মরণ হইত, তবেই উক্ত মত স্বীকার করা চলিত ; কিন্তু
 ব্যঙ্গ্য রসের আশ্বাদনকালে ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান থাকে
 না ; সমূহালম্বনাত্মক এক লোকোত্তর-চমৎকারিত্বেরই
 আশ্বাদন হইয়া থাকে। রত্যাতির স্মৃতিকেও রস বলা চলে
 না। দুধ যেমন দধির কারণ নহে ; সে নিজেই দধিতে
 পরিণত হয় ; রত্যাতি-স্থায়িভাবও তেমনি নিজেরাই রসরূপে
 পরিণত হইয়া থাকে। এইভাবে আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ
 দেখাইয়া দিয়াছেন যে, শব্দালঙ্কার ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদয়
 অলঙ্কার এবং ধ্বনি ও রস প্রভৃতির অবগতি ও প্রতীতির
 জন্য ব্যঞ্জনারূপের স্বীকার অপরিহার্য্য।

সম্প্রতি ব্যঙ্গনার প্রকারভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। মন্সট,
 বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্যঙ্গনারূপ্তিকে
 ব্যঙ্গনার প্রকারভেদ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ;
 যথা—(১) শাকী, এবং (২) আর্থী। যে স্থলে শব্দকে

দিকো রসঃ। স চ ন কার্য্যঃ, বিভাবাদিবিনাশেহপি তস্য সম্ভব-
 প্রসঙ্গাৎ। নাপি জ্ঞাপ্যঃ, সিদ্ধস্য তস্তাসম্ভবাৎ। অপি তু বিভাবাদি-
 তির্ব্যঞ্জিতশ্চরুগীঃ ইতি শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদাঃ।”

— কাব্যপ্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস।

আশ্রয় করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থ উৎপন্ন হয়, সেইস্থলে শাক্তী এবং যে স্থলে অর্থকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, সেইস্থলে আর্থী ব্যঞ্জনা হইয়াছে, বলা হইয়া থাকে। তাহাদের মতে শাক্তী-

ব্যঞ্জনা আবার দুই প্রকার; যথা—(১) শাক্তী ব্যঞ্জনা

অভিধামূল্য, এবং (২) লক্ষণামূল্য। (অভিধা-
লক্ষণামূল্য শব্দশ্রু ব্যঞ্জনা দ্বিধা)। যে স্থলে বাচ্যার্থ-
জ্ঞানের পরই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়, সেই স্থলে অভিধামূল্য
ব্যঞ্জনা, এবং যে স্থলে লক্ষ্যার্থজ্ঞানের পর ব্যঙ্গ্যার্থের
প্রতীতি হয়, সেই স্থলে লক্ষণামূল্য ব্যঞ্জনা হইয়া থাকে
বলিয়া উল্লিখিত আচার্য্যগণ মনে করেন। অভিধামূল্য
ব্যঞ্জনাকে আবার সংযোগ, বিপ্রয়োগ প্রভৃতি অনুসারে
বহুভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সংযোগ প্রভৃতি যে
কয়টির নাম অলঙ্কারশাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহে দেওয়া আছে,
তাহাদের সংখ্যা চৌদ্দ। আচার্য্যগণ কারিকায় আদিশব্দ
নিবদ্ধ করিয়া এতদতিরিক্ত স্থলেও অভিধামূল্য ব্যঞ্জনা
হইতে পারে বলিয়া জানাইয়াছেন।

কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোগাদির
সাহায্যে অভিধামূল্য ব্যঞ্জনার যে সকল উদাহরণ প্রদর্শন
করা হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলটি দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থ
প্রকাশিত না হইয়া বাচ্যার্থমাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে
বলিয়া আমি মনে করি। এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা
অভিধার আলোচনাপ্রসঙ্গেই করিয়াছি। সংযোগাদির

সাহায্যে প্রকাশিত অভিধামূল্য-ব্যঞ্জনার
অভিধামূল্য ব্যঞ্জনা উদাহরণ মৎপ্রণীত 'কাব্য-প্রভাকরঃ' নামক
অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে প্রদর্শন করিতেছি।

সংযোগহেতু ব্যঞ্জনা, যথা—

হরিশ্চন্দ্রস্য হস্তে তু দৃষ্ট্ৱা চক্রং পরিকৃতম্।

জ্যোতিষিকো মুদাবাদীদ ভবাংস্চক্রধরো হরিঃ ॥

এই স্থলে “হরি (হরিশ্চন্দ্র) হরির (বিষ্ণুর) মত”—
এই উপমালঙ্কাররূপ ব্যঙ্গার্থের উৎপত্তির হেতু—চক্রের
সংযোগ। অর্থাৎ বিষ্ণুর হস্তে যেমন চক্র থাকে, হরিশ্চন্দ্রের
হস্তেও তেমনি চক্রচিহ্ন থাকার ফলেই উক্তরূপ উপমার
সমাগম হইয়াছে।

বিয়োগহেতু, যথা—

শঙ্খচক্রে করে ধৃত্বা শঙ্খং নিক্ষিপ্য দূরতঃ।

কশ্চন শুশুভে বালঃ শঙ্খহীনো হরির্বথা ॥

এইস্থলে শঙ্খের বিয়োগ হেতুই ব্যঞ্জনার সাহায্যে উপ-
মালঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে।

সাহচর্য্যে, যথা—

শৌর্য্যাদ্ বভূবতুর্বারৌ সাক্ষাদ্ ভীমার্জ্জুনৌ যুধি।

এই স্থলে ভীমের সাহচর্য্যহেতু অর্জুন শব্দে পার্থকে
বুঝাইল। সাক্ষাৎ শব্দের দুইটি অর্থ (সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-
তুল্যায়োঃ)। তুল্যার্থে সাক্ষাৎ শব্দটিকে গ্রহণ করিলে এই
স্থলে উপমালঙ্কার এবং প্রত্যক্ষ অর্থে গ্রহণ করিলে বিশ্বনাথ

প্রভৃতির মতে 'অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য-রূপক' অলঙ্কার হইতেছে।
আমার মতে প্রত্যক্ষ অর্থে সাক্ষাৎ শব্দটিকে গ্রহণ করিলে
এই স্থলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার স্বীকার্য্য; কারণ, আমি
'অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য-রূপক' নামে পৃথক্ অলঙ্কার স্বীকারের
প্রয়োজন বোধ করি না। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা
'কাব্য-প্রভাকরঃ' নামক গ্রন্থে করিয়াছি।

বিরোধে, যথা—

বদিতুং কঃ সমর্থঃ স্মাৎ কর্ণার্জ্জুন-পরাক্রমম্।

কর্ণের সহিত পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুনের বিরোধই চিরপ্রসিদ্ধ।
এই বিরোধহেতু এখানে অর্জ্জুন শব্দে পাণ্ডুতনয়কেই
বুঝাইল। কর্ণ ও অর্জ্জুনের পরাক্রমের আধিক্য বুঝাইবার
জন্তু এই ক্ষেত্রে 'কঃ সমর্থঃ স্মাৎ' এই বাক্যটিদ্বারা কাকুবশতঃ
'কেহই সমর্থ নহে' এইরূপ ব্যাঙ্গ্যর্থ প্রকাশিত হওয়ায়
'সম্বন্ধে অসম্বন্ধ'-রূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে।

অর্থ (কারণ)—

“মহীভূতস্তস্য চ মন্মথশ্রিয়া, নিজস্য চিত্তস্য চ তং প্রতীচ্ছয়া।
দ্বিধা নৃপে তত্র জগজ্জয়ীভূবাং, নতক্রবাং মন্মথবিস্রমোহভবৎ॥”

এখানে মন্মথশ্রীরূপ হেতু বা কারণবশতঃ দ্ব্যর্থক মহীভূৎ-
শব্দের নৃপতিরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে। (‘মন্মথের শ্রীর
মত শ্রী রাজার মধ্যে আছে’—এইরূপ উপমালঙ্কার এইস্থলে
ব্যঙ্গ্য হইয়াছে)।

কবিসম্রাট ৩৭রবীন্দ্রনাথের ‘স্পর্শমণি’ নামক সর্বজনবিদিত

বাংলা কবিতা হইতে ইহার আর একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। যথা—

“যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি,
তাহারই খানিক আমি মাগি নতশিরে”।

এই স্থলে মণিকে মণি বলিয়া না মানা রূপ কারণ থাকায় ধনশব্দে তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝাইল।

প্রকরণ—

‘মাতৃদেবো ভব’, ‘পিতৃদেবো ভব’, ‘অতিথি-দেবো ভব’—এই সকল বাক্যে দেবশব্দ গূঢ়্য অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার হেতু—প্রকরণ-পর্যালোচনা।

লিঙ্গ—

সংগ্রামে ফাল্গুনিবীরঃ প্রজজ্বালান্তেজসা।

এই বাক্যে প্রজ্বলনরূপ চিহ্নদ্বারা অর্জুনের অগ্নিসাদৃশ্য প্রতীত হইতেছে। সাদৃশ্য-কল্পনারূপ বৈচিত্র্য থাকায় অভিধা হইতে ইহার পার্থক্যও পরিস্ফুট।

অনুশব্দসন্নিধি—

“কদলী কদলী, করভঃ করভঃ, করিরাজকরঃ করিরাজকরঃ।
ভুবন-ত্রিতয়েইপি বিভর্তি তুলামিদমুরুযুগং ন চমুরুদৃশঃ” ॥

এই শ্লোকে প্রথম কদল্যাदिशব্দের সান্নিধ্যহেতু দ্বিতীয় কদল্যাदिशব্দ ‘জড়ত্ব’ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এখানে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্যহেতু বস্তুধ্বনি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন।

সামর্থ্য—

‘মুখচন্দ্রঃ চুস্বতি’ বাক্যে চুস্বন-গ্রহণের সামর্থ্য মুখেই আছে বলিয়া ‘চন্দ্র’ শব্দ চন্দ্রসদৃশ অর্থে প্রযুক্ত হইল।

ঐচ্ছিত্য—

“অহো অহোভির্মহিমা হিমাগমে-

হপ্যাভিপ্রপেদে প্রতি তাং স্বরাদিতাম্।

তপন্তুপূর্তাবপি মেদসাং ভরা

বিভাবরীভির্বিভরাষভুবিরে ॥”

এই স্থলে রাত্রির পক্ষে মেদ ধারণ সম্ভবপর নহে বলিয়া ঐচ্ছিত্যবশতঃ ‘মেদসাং ভরাঃ’ পদদ্বয় ‘দীর্ঘত্ব’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে আবার মেদবহুল স্থূলকায়ী নারীর ব্যবহার রাত্রিতে সমারোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

সামর্থ্যস্থলে ‘মুখচন্দ্রঃ চুস্বতি’ বাক্যে যেমন চুস্বনগ্রহণের যোগ্যতা কেবল মুখেই আছে, চন্দ্রে নাই; এখানে সেরূপ নহে। ‘রাত্রিতে নিশাচরগণকর্তৃক নিহত জন্তু ও মনুষ্য প্রভৃতির মেদ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইত’—প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ করিলে রাত্রিরও মেদধারণের যোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই, এখানে যোগ্যতার চেয়ে ঐচ্ছিত্যেরই প্রাধান্য। এইরূপে,

“উরোভুবা কুন্তযুগেন জুস্তিতং

নবোপহারেণ বয়স্কুতেন কিম্।

ত্রপাসরিদুর্গমপি প্রতীর্ঘ্য সা,

নলম্ব তদ্বী হৃদয়ং বিবেশ যৎ” ॥

এই শ্লোকে ঔচিত্যহেতু কুন্তশব্দে স্তনকে বুঝাইল।

দেশ—

‘গগনমণ্ডলভূষণং দ্বিজরাজং পশ্য’ বলিলে গগনস্থিতিহেতু দ্বিজরাজশব্দে চন্দ্রকে বুঝায়। এখানে কেবল স্থিতিমাত্র অর্থ নহে; কিন্তু, স্থিতিহেতুক বৈচিত্র্যের উল্লেখ থাকায় ব্যঞ্জনা হইয়াছে।

কাল—

“শারদ-পূর্ণিমা-বিভাবরী খলু দ্বিজরাজেন সমুল্লসিতা”।
এই বাক্যে শারদ-পূর্ণিমা-বিভাবরীরূপ কালই দ্বিজরাজশব্দে চন্দ্রকে বুঝাইবার হেতু। তাহাতে আবার ‘সমুল্লসিতা’ পদটি ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রকটিত করিয়া দিতেছে।

ব্যক্তি—

ব্যক্তিশব্দে যে স্ত্রী-পুং-নপুংসকাদি লিঙ্গকে বুঝায়, তাহা অভিধার আলোচনাগ্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। ইহার উদাহরণ, যথা—

“অসমাপ্তজিগীষস্ত স্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ।

অনাক্রম্য জগৎ কুৎসং ন সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ” ॥

এখানে পুং-স্ত্রীলিঙ্গসাম্যহেতুক রবি ও সন্ধ্যা শব্দের অর্থদ্বয়ে নায়ক-নারিকাভাব আরোপিত হইয়াছে, এবং ইহার ফলে সমাসোক্তি-অলঙ্কাররূপ ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশিত হইতেছে।

স্বর—

কাকুবৈশিষ্ট্যে যে ব্যঙ্গনা হয়, তাহাকেই আমরা স্বরবৈশিষ্ট্যাহেতু-ব্যঙ্গনার উদাহরণরূপে স্থাপন করিতে পারি ; কারণ, কাকু ধ্বনি বা স্বরের বিকারভিন্ন আর কিছুই নহে (ন) । যে স্থলে কাকুস্বরযুক্ত শব্দের প্রবণে বাটিতি ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়, সেই স্থলে ‘স্বরবৈশিষ্ট্যে (অভিধামূল্য) ব্যঙ্গনা’, এবং যে স্থলে বাক্যার্থ-চিন্তনের পর ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়, সেই স্থলে ‘কাকুবৈশিষ্ট্যে আর্থী ব্যঙ্গনা’ স্বীকার করা যায় ।

যদিও ব্যঙ্গ্যার্থমাত্রই বাক্যার্থচিন্তনের পর প্রতিভাসমান হইয়া থাকে, তথাপি অভিধামূল্য-ব্যঙ্গনাস্থলে যেরূপ বাটিতি ব্যঙ্গ্যার্থের উপলব্ধি হয়, আর্থী-ব্যঙ্গনাস্থলে সেইরূপ বাটিতি তাহার উপলব্ধি হয় না । কাকুস্বর-বৈশিষ্ট্যে আর্থী-ব্যঙ্গনার উদাহরণ পরে প্রদত্ত হইবে ।

কাকুস্বরবৈশিষ্ট্যে অভিধামূল্য ব্যঙ্গনা, যথা—

“কালে কোকিল-বাচালে সহকার-মনোহরে ।

কৃতাগসঃ পরিত্যাগান্তস্তাশ্চেতো ন দূয়তে” ॥

(ন) ভিন্নকণ্ঠধ্বনিধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে । (সাহিত্যদর্পণধৃত)

বাক্যাভিধীয়মানেহর্থে যেনাঙ্গঃ প্রতিপত্ততে ।

ভিন্নকণ্ঠধ্বনিধীরৈঃ স কাকুরিতি কথ্যতে ॥

(মঃ মঃ দুর্গাপ্রসাদধৃত)

কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদিভিধ্বনৈঃ ।

(অমরকোষ, স্বর্গবর্গ)

এখানে 'ন দূয়তে' এই নিষেধবাক্যটি কাকুশ্বরবৈশিষ্ট্য-
হেতু 'দূয়তে' এই বিধিসূচক অর্থ প্রকাশ করিতেছে।
আচার্য্য বিশ্বনাথ শব্দালঙ্কার বক্তোক্তির উদাহরণে
এই শ্লোকটি স্থাপন করিয়া এইস্থলে যে শব্দপ্রবণের
পরই ব্যঙ্গ্যার্থের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা স্বীকার
করিয়াছেন।

'স্বরাদয়ঃ' এই পদের আদিশব্দদ্বারা চেষ্টাপ্রভৃতির
বৈশিষ্ট্যও ব্যঞ্জনা হয় বলিয়া আচার্য্য জানাইয়া-
ছেন। চেষ্টাবৈশিষ্ট্যে অভিধামূল্যব্যঙ্গনার উদাহরণ,
যথা—

‘এতাবন্মাত্রস্তনী’।

এই স্থলে বাচ্যার্থবোধের প্রায় সঙ্গ্রে সঙ্গ্রেই
ব্যঙ্গ্যার্থ শৃঙ্গাররসের জ্ঞান হইতেছে; এইজন্য অভিধামূল্য
ব্যঙ্গনা হইল।

মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ লক্ষণামূল্য-ব্যঙ্গনা
নামে শাব্দী ব্যঙ্গনার প্রকারভেদ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন

লক্ষণামূল্য ব্যঙ্গনা যে, যে ক্ষেত্রে লক্ষণার সাহায্যে ব্যঙ্গ্যার্থ
প্রকাশিত হয়, সেই ক্ষেত্রে লক্ষণামূল্যব্যঙ্গনা
স্বীকৃত হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে
ধ্বনি নির্ণয় প্রসঙ্গে আচার্য্য বিশ্বনাথ এই লক্ষণামূল্য ব্যঙ্গনার
দুইটি ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—(১) অর্থান্তর-
সংক্রমিতবাচ্য, এবং (২) অত্যন্ত-তিরস্কৃতবাচ্য।

অর্থান্তর-সংক্রমিতবাচ্য-ব্যঙ্গনার উদাহরণ, যথা—

“কদলী কদলী, করভঃ করভঃ করিরাজকরঃ

করিরাজকরঃ ।

ভুবন-ত্রিতয়েহপি বিভক্তি তুলামিদমুরুযুগং ন

চমুরুদৃশঃ” ॥

এই শ্লোকে প্রথম কদলীশব্দ সাধারণ কদলীঅর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু দ্বিতীয় কদলীশব্দটির অর্থ ইহা হইতে পৃথক্ । বিশ্বনাথ বলেন, এই স্থলে দ্বিতীয় কদলী শব্দে জাড্যাদি-গুণবিশিষ্ট কদলীকে বুঝাইতেছে । এখানে বাচ্যার্থ অর্থান্তরে সংক্রমিত হওয়ায় ইহার উল্লিখিত নাম করা হইল । এইরূপে দ্বিতীয় ‘করভ’ এবং ‘করিরাজকর’ শব্দ দুইটিও ব্যঙ্গ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ।

‘অত্যন্ত-তিরস্কৃতবাচ্য, যথা—

“নিঃশ্বাসান্ন ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে” ।

এই স্থলে অন্ধশব্দটি দৃষ্টিশক্তিহীনরূপ মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু অপ্রকাশরূপ অর্থ বুঝাইতেছে । এখানে বাচ্যার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ‘অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য’ বলা হয় ।

বস্তুতঃ, শাব্দী ব্যঙ্গনার মধ্যে অভিধামূল্য এবং লক্ষণামূল্য নামে দুইটি বিভাগ কল্পনা করা আমি সঙ্গত মনে করি না । লক্ষণামূল্য-ব্যঙ্গনার সাহিত্যদর্পণোক্ত যে দুইটি প্রকারভেদের উদাহরণ

উপরে প্রদত্ত হইল, তাহাতে লক্ষণার কোন কার্যকারিতাই দেখা যায় না। কদলীশব্দের লক্ষ্যার্থ কদলীসদৃশগুণযুক্ত পদার্থবিশেষে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু এখানে সেই রকম অর্থে উহা প্রযুক্ত হয় নাই। এক্ষেত্রে কদলীশব্দের অর্থ 'প্রভূত-জড়ত্বাদিদোষযুক্ত'। এই অর্থের সহিত মুখ্যার্থের সংযোগ না থাকার ফলেই এখানে ব্যঞ্জनावৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

আচার্য্য বিশ্বনাথ কদলীশব্দে লক্ষ্যার্থ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাদ্বারা জাড্যাদিগুণযুক্ত কদলীকে বুঝাইতেছে, এবং এক্ষেত্রে জাড্যাদির আতিশয্যই ব্যঙ্গ্য। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, দ্বিতীয় কদলী শব্দটি প্রথম কদলী-শব্দের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়া 'প্রভূত-জড়ত্বাদি-দোষযুক্ত' এইরূপ অর্থ ব্যঞ্জनावৃত্তির সাহায্যে বুঝাইতেছে, এবং লক্ষণার সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলিলে যেমন গঙ্গাশব্দ লক্ষ্যার্থের সাহায্যে শীতল-পাবনত্বাদিবিশিষ্ট গঙ্গাকে বুঝায় না, কিন্তু গঙ্গাসংযুক্ত তীরকে বুঝায়, এক্ষেত্রেও তেমনি কদলীশব্দের লক্ষ্যার্থ গৃহীত হইলে তাহা কদলীর সহিত সংযুক্ত অন্য কিছুকে বুঝাইত। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলিলে গঙ্গাশব্দে যখন গঙ্গাসংযুক্ত তীরমাত্র অর্থ বুঝায় তখনই লক্ষণা হয়; কিন্তু যখন শীতলপাবনত্বাদির আধিক্য বুঝাইয়া থাকে, তখন হয় ব্যঞ্জনা। এক্ষেত্রেও তেমনি ব্যঞ্জনা হইল।

আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন—‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ এই বাক্যে জলপ্রবাহরূপ অর্থ বুঝাইয়া গঙ্গাশব্দের অভিধা এবং গঙ্গাভীরুরূপ অর্থ বুঝাইয়া তাহার লক্ষণা বিবৃত হইলে পর যে বৃত্তির সাহায্যে শীতত্ব-পাবনত্বাদির আতিশয্যের প্রতীতি জন্মে, তাহাই লক্ষণামূল্য ব্যঙ্গনা (প)

উল্লিখিত অর্থে যে উক্তস্থলে ব্যঙ্গনা হয়, তাহা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু, ইহাকে লক্ষণামূল্য বলিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। বস্তুতঃ, প্রকরণাদি-পর্যালোচনা না করিলে গঙ্গাশব্দের উল্লিখিত অর্থ পাওয়া যায় না। আচার্য্য বিশ্বনাথ প্রকরণ প্রভৃতি দ্বারা অর্থবোধ হইলে তাহাকে অভিধামূল্যব্যঙ্গনা নামে অভিহিত করেন; কাজেই এক্ষেত্রেও তাঁহার মতে অভিধামূল্য ব্যঙ্গনাই হইয়া যাই-তেছে। অভিধামূল্য হইলে তাহাকে আর লক্ষণামূল্য বলা চলে না। এক্ষেত্রে প্রকরণাদি পর্যালোচনা না করিয়াই গঙ্গাশব্দের ব্যঙ্গ্যার্থ পাওয়া যায়—এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক; কারণ, তাদৃশস্থলে ঐরূপ অর্থ বুঝাইবার সামর্থ্যই গঙ্গাশব্দের থাকিবে না। যদি গঙ্গাশব্দের ঐরূপ সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে যখনই গঙ্গাশব্দের উচ্চারণ

(প) “গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ জলময়্যন্তর্থাবোধনাদভিধায়াং তটাত্ত্ব-বোধনাচ্চ লক্ষণায়াং বিয়ভায়াং যয়া শীতত্ব-পাবনত্বাত্তিশয্যাদিবোধ্যতে সা লক্ষণামূল্য ব্যঙ্গনা।”

করা হইত, তখনই ঐরূপ অর্থ বুঝাইত, এবং তাহার ফলে ঐ অর্থটিও মুখ্যই হইয়া পড়িত।

‘নিঃস্বাসান্ধ’ পদে অন্ধশব্দের উল্লিখিত অর্থটিও প্রকরণ-পর্যালোচনার ফলেই পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রেও লক্ষণার কোন উপযোগিতা আমরা দেখিতে পাই না। এইরূপে ‘ভ্রম ধার্মিক.....’ ইত্যাদি দর্পণোক্ত অপর উদাহরণে এবং ‘উপকৃতং বহু তত্র.....’ ইত্যাদি অন্য উদাহরণেও বস্তুতঃ লক্ষণাই হয় নাই বলিয়া আমরা মনে করি।

মন্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্যগণ আর্থীব্যঞ্জনাকে আবার কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আর্থীব্যঞ্জনা তাহাদের ১০টির নাম ও উদাহরণ দিয়া জানাইয়াছেন যে, ইহা ছাড়াও চেষ্টা প্রভৃতি অর্থে আর্থীব্যঞ্জনাই হইতে পারে (ক)। ইহাদের নাম ও উদাহরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

(ক) বক্তৃবোদ্ধব্যাক্যকূনাং বাক্যবাচ্যান্তসন্নিধেঃ।

প্রস্তাব-দেশ-কালাদেবৈশিষ্ট্যাং প্রতিভাজ্জন্ম।

যোহর্থশ্চাত্তার্থধীহেতুর্ভূত্যাপারো ব্যক্তিরেব সা ॥

(কাব্যপ্রকাশ, তৃতীয় উল্লাস)

“বক্তৃবোদ্ধব্যাক্যানামন্তসন্নিধিবাচ্যয়োঃ।

প্রস্তাব-দেশ-কালানাং কাকোশ্চেষ্টাদিকশ্চ চ।

বৈশিষ্ট্যাদন্তমর্থং যা বোধয়েৎ সার্থসম্ভবা” ॥

—সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১) বক্তৃবৈশিষ্ট্যে, যথা—মৎপ্রণীত ‘রুরুপ্রমদ্বরম্’
নামক রূপকে—

“পক্ষমাত্রফলং স্যাচ্চ বৃক্ষাগ্রে বর্জতে যদি ।

শিশুতৃপ্তিবিধানায় শক্তিস্তস্য কুতো ভবেৎ” ॥

এইস্থলে—বৃক্ষাগ্রস্থিত আত্রফল যেমন শিশুর পক্ষে
হল’ভ, তেমনি ‘প্রমদ্বরা’-নাম্নী নায়িকাও আমার পক্ষে
হল’ভ—এইরূপ অর্থ বক্তার বৈশিষ্ট্য হেতু ব্যক্ত হইতেছে ।

(২) বোদ্ধব্য = শ্রোতা । ইহার বৈশিষ্ট্যে, যথা—

“নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনভটং নিষ্মৃষ্টরাগোহধরঃ,

নেত্রে দূরমনঞ্জে, পুলকিতা তদ্বি ভবেয়ং তনুঃ ।

মিথ্যাবাদিনি দূতি ! বান্ধবজনশ্রাজ্জাতপীড়াগমে

বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি, ন পুনস্তশ্রাদ্ধমশ্রাস্তিকম্” ॥

এই স্থলে ‘তাহার নিকটই রমণ করিবার জন্ম গিয়া-
ছিলে’—এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ বোদ্ধব্য দূতীর বৈশিষ্ট্য হেতু
পাওয়া যাইতেছে ।

(৩) বাক্যবৈশিষ্ট্যে যথা, মদীয় রুরুপ্রমদ্বরে—

“গগনতলপদব্যাং শ্রুস্তপাদো বিবস্থা-

নখিল-ভুবনসংস্থং হস্তি বাহুং তমিশ্রম্ ।

বিজিততপনভেজাস্তপসা ব্রহ্মবর্ষ্যো

নৃহৃদয়মপি যাতং দৃষ্টিমাত্রং হিনস্তি” ॥

এখানে ‘আপনার আগমনে আমরা পবিত্র হইলাম’—

এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ বাক্যের বৈশিষ্ট্যহেতুই পাওয়া যাইতেছে ।

মৎ প্রণীত ‘মানব-প্রজ্ঞাপতীয়ম্’ * নামক সংস্কৃত কাব্য
হইতে ইহার আর একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।
যথা—

“মধুসখ-বিহগানাং শব্দমাত্রং মনোজ্ঞং

ভ্রমর-রুচিরবর্ণো ভ্রশ্যতে স্পর্শমাত্রম্।

উরগ-নিবহমধ্যে দৃশ্যতে চেৎ সুবর্ণঃ

স চ ন হৃদয়হারী তদ্বিষম্ভ্রান্তিভীতেঃ ॥”

এখানে “যে জিনিষ যতই ভাল হউক না কেন, তাহার
খারাপের দিকও একটি আছে”—এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ বাক্যের
বৈশিষ্ট্য হেতু পাওয়া যাইতেছে।

(৪) অন্তসন্নিধিবৈশিষ্ট্যে, যথা—

‘উত্ত নিম্নল নিম্নন্দা ভিসিগীপত্তম্মি রেহই বলাআ।

নিম্মল-মরগঅ-ভাঅণ-পরিট্টিআ সজ্জসুত্তি বব” ॥

এইস্থলে নিম্পন্দ বলাকার সন্নিধিহেতু স্থানের নির্জনতা
ব্যক্ত হইতেছে।

(৫) বাচ্যবৈশিষ্ট্যে যথা—

“উদ্দেশোহয়ং সরসকদলীশ্চেনিশোভাভিশায়ী

কুঞ্জোৎকর্ষাঙ্কুরিত-রমণীবিভ্রমো নর্মদায়াঃ।

কিঞ্চৈতস্মিন্ সুরতসুহৃদসুস্থি! তে বাস্তি বাতা

যেষামগ্রে সরতি কলিতাকাণ্ডকোপো মনোভূঃ” ॥

* কয়েক বৎসর পূর্বে ‘কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা’য়
এই কাব্যখানা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এখানে বর্ণনীয় বিষয়সমূহের বৈশিষ্ট্যহেতু 'রমণার্থ প্রবেশ কর' এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ পাওয়া যাইতেছে।

(৬) প্রস্তাব = প্রকরণ। ইহার বৈশিষ্ট্যে যথা, রূরু-প্রমদ্বরে—

“কুধাতুরস্ত বালস্ত ক্রীড়ণকেন কিং ভবেৎ ?

তৃষ্ণয়া পীড়্যমানস্ত কিং স্বর্ণেন জলং বিনা ?” ॥

এইস্থলে 'প্রিয়ার জীবন ভিন্ন অন্য কিছুই চাহি না'—
এইরূপ অর্থ প্রকরণ-বশতঃ পাওয়া যাইতেছে।

'মানব-প্রজাপত্তীয়া' হইতে ইহার আর একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। যথা—

“বিগতসকলহর্ষা নাসিকাদৃষ্টিমাত্রঃ

হৃতমুনিজনচিত্তা স্বর্গবেশা যুতাচী।

অপি চ মদনকেতুং গণ্ডযুগ্মং বিলোকা

ক্ষয়িত-সকলভাবা তত্র রস্তা প্রজাতা ॥”

এই স্থলে প্রকরণ-বৈশিষ্ট্য-হেতু রস্তাশব্দের অপ্সরাবিশেষরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে।

(৭) দেশবৈশিষ্ট্যে, যথা—

“অন্যত্র যুয়ং কুসুমাবচায়ং

কুরুধ্বমত্রাশ্মি করোমি সখ্যঃ।

নাহং হি দূরং ভ্রমিতুং সমর্থ্য,

প্রসীদতায়ং রচিতোহঞ্জলির্বঃ” ॥

এখানে দেশবৈশিষ্ট্যহেতু 'এই নির্জন স্থানে প্রচ্ছন্ন

কামুকের সহিত মিলিত হইবে' এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ পাওয়া যাইতেছে।

(৮) কালবৈশিষ্ট্যে, যথা—

“কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধরা

ধীরা বহন্তি রতিখেদহরাঃ সমীরাঃ।

কেলীবনীয়মপি বঞ্জুলকুঞ্জমঞ্জু-

দূরে পতিঃ কথয় কিং করণীয়মতু” ॥

এই ক্ষেত্রে ‘শীঘ্র এখানে প্রচ্ছন্ন কামুককে প্রেরণ কর’ এইরূপ অর্থ কালের বৈশিষ্ট্য হেতু পাওয়া যাইতেছে।

(৯) কাকুবৈশিষ্ট্যে, যথা—

“গুরুপরতন্ত্রতয়া বত দূরতরং দেশমুত্ততো গন্তুম্।

অলিকুলকোকিলললিতে নৈশ্চ্যতি সখি সুরভিসময়েহসৌ” ॥

এখানে উচ্চারণবৈশিষ্ট্যরূপ কাকুদ্বারা ‘নৈশ্চ্যতি’ (আসি-
বেন না) এই নিষেধার্থক কথাটি ‘এশ্চ্যত্যেব’ (অবশ্যই
আসিবেন) এইরূপ বিধিসূচক ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ করিতেছে।

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মহাভাষ্যে পতঞ্জলি
কাকুশন্দের ‘জিহ্বা’ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, (ব) অতএব
কাকুশন্দের উচ্চারণবৈশিষ্ট্যকে বুঝিব কেন? ইহার উত্তরে
আমরা বলিব—জিহ্বাবাচক কাকুশন্দের জিহ্বার ব্যাপারকেও
বুঝায়। অন্তত আচার্য্যগণ এইরূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন

(ব) কাকুজিহ্বা।

(মহাভাষ্য, পাম্পশা)

(ভ)। তাহা ছাড়া উচ্চারণবৈশিষ্ট্য অর্থে কাকুর অণ্যাত্ম লক্ষণ পূর্বেই পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১০) চেষ্টা শব্দে হস্ত, পদ, মুখ, নেত্র, মস্তক প্রভৃতির পরিস্পন্দন ব্যাপারকে বুঝায়। চেষ্টার বৈশিষ্ট্যে, যথা—

“সঙ্কেতকালমনসং বিটং জ্ঞাত্বা বিদঙ্কয়া।

হসরোত্রাপিতাকৃতং লীলাপদ্মং নিমীলিতম্” ॥

এখানে নেত্রের ইঙ্গিতদ্বারা প্রদর্শিত পদ্মনিমীলনরূপ চেষ্টাদ্বারা ‘সঙ্ক্যা সঙ্কেতকাল’—এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ পাওয়া যাইতেছে।

কারিকায় আদিশব্দ গ্রহণ করিয়া চেষ্টাবিরহ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যেও যে অর্থী ব্যঙ্গনা হয়, ইহা জানান হইয়াছে। চেষ্টাবিরহবৈশিষ্ট্যে যথা—

“নাদন্তে ভূষণং দন্তং নাহূতা চিরমুচ্ছতি।

মৃগাঙ্গী ন ক্ষিপত্যক্ষি সাদরং ময়ি পশ্যতি” ॥

এখানে চেষ্টার বিরহদ্বারা কোপ ব্যক্ত হইতেছে। এইরূপ অন্ত্রও অর্থী ব্যঙ্গনা হইতে পারে।

অর্থ বাচ্য, লক্ষ্য, ও ব্যঙ্গ্যভেদে তিন প্রকার হইতে পারে; এই জন্য অর্থী-ব্যঙ্গনার উল্লিখিত ভেদগুলির প্রত্যেকটিকে আবার আচার্য্য বিশ্বনাথ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে স্থলে বাচ্যার্থবোধের পর ব্যঙ্গ্যার্থের জ্ঞান হয়, সেই

(ভ) ‘কাকুর্ধনৈবিকারঃ’—মশটভট্ট।

‘কায়তর্যাস্তরমিতি কাকুঃ’। —মঃ মঃ দুর্গাপ্রসাদ।

স্থলে বাচ্যার্থের ব্যঞ্জনা, লক্ষ্যার্থবোধের পর ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইলে লক্ষ্যার্থের এবং ব্যঙ্গ্যার্থবোধের পর হইলে ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জনা বিশ্বনাথ প্রভৃতির মতে স্বীকৃত হয়।
বাচ্যার্থের ব্যঞ্জনা, যথা—

“কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধ্বা

ধীরা বহন্তি রতিখেদহরাঃ সমীরাঃ।

কেলীবনীয়মপি বঞ্জুলকুঞ্জমঞ্জু-

দূরে পতিঃ কথয় কিং করণীয়মতু” ॥

এই স্থলে শ্লোকের বাচ্যার্থ-প্রতীতির পর ‘শীঘ্র কোন প্রচ্ছন্ন কামুকের সহিত আমার সংযোগ ঘটাইয়া দাও’ এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ পাওয়া যাইতেছে।

লক্ষ্যার্থের ব্যঞ্জনা যথা—

“নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং নিৰ্ম্মষ্টরাগোহধরঃ

নেত্রে দূরমনঞ্জনে, পুলকিতা তস্মি তবেয়ং তনুঃ।

মিথ্যাবাদিনি দূতি, বান্ধবজনস্বাজ্জাতপীড়াগমে!

বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ন পুনস্তস্মাদধমস্তাস্তিকম্” ॥

বিশ্বনাথ বলেন--এই শ্লোকে বাচ্যার্থবোধের পর বিপরীতলক্ষণাদ্বারা ‘তাহার নিকটই গিয়াছিলে’ এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে। তারপর ব্যঞ্জনার সাহায্যে ‘সহ-বাসের উদ্দেশ্যে’ এইরূপ অর্থ পাওয়া গেল।

ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জনা যথা—

“উঅ নিচ্চল, নিম্পন্দা ভিসিণীপত্তম্মি রেহই বলাআ ।

নিম্মলমরগঅভাঅগপরিটিঠআ সম্বসুত্তিব্ব ॥”

এক্ষেত্রে বাচ্যার্থবোধের পর ‘এই স্থানটি নির্জন’ এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইল। তাহার পর ‘অতএব ইহাই সম্বন্ধে স্থান’ এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ পূর্বোক্ত ব্যঙ্গ্যার্থের সাহায্যে পাওয়া গেল।

বস্তুতঃ, লক্ষ্যার্থের ব্যঙ্গনা নামে একটি স্বতন্ত্র ভেদস্বীকার করা আমাদের বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত নহে। আচার্য্য বিশ্বনাথ প্রভৃতির স্বীকৃত বিপরীত-লক্ষণা বস্তুতঃ লক্ষণাই নহে ; উহা ব্যঙ্গনা। লক্ষণা-বিচার-প্রকরণে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

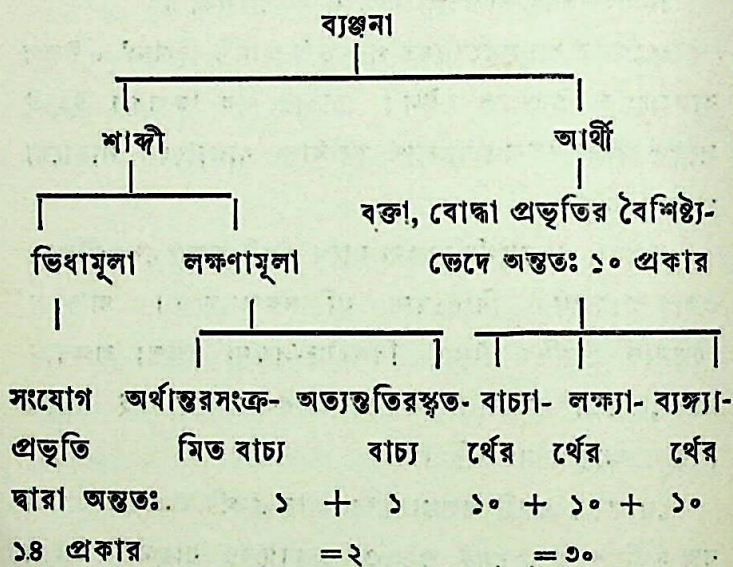
যে স্থলে একটি অলঙ্কারদ্বারা আর একটি অলঙ্কার অথবা বস্তু ধ্বনিত হয়, সেই স্থলেও ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঙ্গনাই হইয়া থাকে। যথা—

“আপতন্তুময়ং দূরাহরীকৃত-পরাক্রমঃ ।

বলোহবলোকয়ামাস মাতঙ্গমিব কেশরী ॥”

এই শ্লোকে উপমালঙ্কারটি ব্যঙ্গ্য হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা বস্তু ও অলঙ্কার দুইই ধ্বনিত হইতেছে। বস্তুধ্বনি যথা—‘বলদেব শীঘ্রই বেণুদারীকে বধ করিবেন।’ অলঙ্কার ধ্বনি যথা—‘বেণুদারী হইতে বলদেবের প্রতাপ অধিক’— এই ব্যতিরেক অলঙ্কার।

উক্ত আচার্য্যগণের স্বীকৃত ভেদসমূহকে আমরা



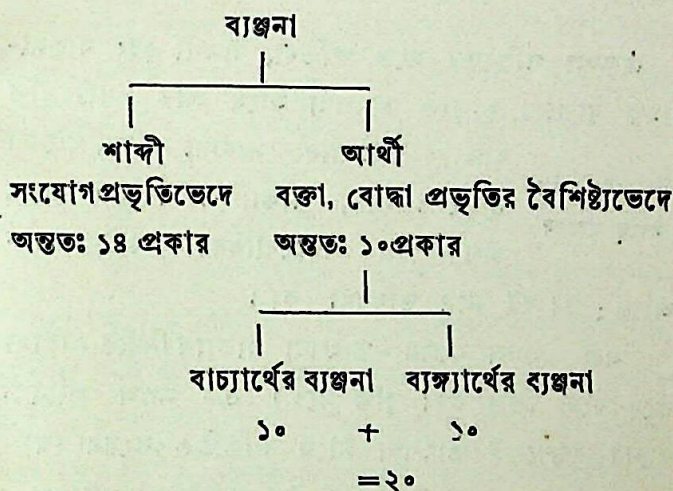
শব্দ ছাড়া অর্থ থাকে না, এবং অর্থ ছাড়া শব্দও থাকে না; কাজেই, শাস্ত্রী-ব্যঞ্জনাস্থলেও অর্থের সহকারিতা এবং আর্থী-ব্যঞ্জনাস্থলেও শব্দের সহকারিতার আবশ্যক হয়। শব্দ এবং অর্থের মধ্যে যে এইরূপ অপরিহার্য্য সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। আচার্য্যগণ বলেন—

"शकबोधो। व्यनङ्ग्यर्थः शकोऽप्यर्थान्तराश्रयः ।

একম্ভ ব্যঞ্জকত্বে তদন্যম্ভ সহকারিতা ।”

সম্প্রতি ব্যঞ্জনাবৃত্তির প্রকারভেদসম্বন্ধে আমার নিজস্ব

নিম্ন মত মতটি প্রকাশ করিতেছি। নিম্নের তালিকা
হইতে পাঠকগণ অনায়াসেই তাহা বুঝিতে
পারিবেন।



সমষ্টি = ১৪ + ২০ = ৩৪ প্রকার ; অথবা ততোধিক।

[সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে স্বীকৃত লক্ষণামূল্যব্যঞ্জনানামে
শাকীব্যঞ্জনার প্রকারভেদ ও তাহার অবাস্তরবিভাগ এবং
আর্থী-ব্যঞ্জনাতে লক্ষ্যার্থের ব্যঞ্জনা নামে স্বতন্ত্র বিভাগ আমি
যে কারণে স্বীকার করিতে চাহি না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শন
করিয়াছি]।

তাৎপর্য্য

একদল পণ্ডিতের মতে অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা-
নামক বৃত্তিত্রয় ছাড়াও তাৎপর্য্য নামে আর একটি বৃত্তি
বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে।
তাৎপর্য্যের স্বরূপ ইহাদের মতে, বাক্যস্থিত বিভিন্ন পদের
সম্বন্ধে মতভেদ অর্থসমূহের অর্থবোধিকা একটি শক্তি
আছে; ইহারই নাম তাৎপর্য্য (ক)।

অন্য একদল বলেন—তাৎপর্য্য বাক্যার্থনির্ণয়ে সাহায্য
করে বটে, কিন্তু ইহা বৃত্তি নহে। এই সকল আচার্য্য
বক্তার ইচ্ছাকেই তাৎপর্য্য নামে অভিহিত করেন (খ)।
অপর একদল আচার্য্যের মতে ঈশ্বরেচ্ছাই তাৎপর্য্য (গ)।

(ক) তাৎপর্য্যার্থ্যং বৃত্তিমাছঃ পদার্থাধ্বয়বোধনে।

(সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

অভিধায়া একৈক্যপদার্থবোধনবিষমাদ্ বাক্যার্থরূপস্ত পদার্থাধ্বয়স্ত
বোধিকা তাৎপর্য্যং নাম বৃত্তিঃ। (ঐ ব্যাখ্যা)

(খ) বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্য্যং পরিকীর্তিতম্। (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

নানার্থস্থলে লোকে তাৎপর্য্যাস্ত এতৎ পদং বাক্যং বা এতদর্থ-
প্রত্যয়ায় ময়োচ্চাৰ্য্যত ইতি প্রযোক্তুরিচ্ছারূপম্। (পরমলঘুমঞ্জুবা)

(গ) এতদ্ বাক্যং পদং বা এতদর্থবোধায়োচ্চারণীয়মিতীশ্বরেচ্ছা
তাৎপর্য্যন্। (পরমলঘুমঞ্জুবা)

অন্য একদল পণ্ডিত (অদ্বিতাভিধানবাদিগণ) তাৎপর্যের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহেন না। এই সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা উপক্রমণিকাতেই করা হইয়াছে।

ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাৎপর্য শব্দের অর্থ—তন্নিষ্ঠতা। তৎপর=তন্নিষ্ঠ। তৎপরের ভাব=তাৎপর্য। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই—তৎপর শব্দের অন্তর্গত তদ্ শব্দের অর্থ

তাৎপর্য শব্দের
ব্যুৎপত্তি

কি? বাক্যস্থিত পদসমূহকে যদি তদশব্দে ধরা যায়, তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায়—বাক্য-স্থিত বিভিন্ন পদের অর্থসমূহের অর্থ-বোধিকা শক্তিই তাৎপর্য। আবার তদশব্দে বাক্যের বক্তাকে বুঝিলে অর্থ দাঁড়ায়—বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য। বস্তুতঃ বক্তা যে ভাবটি প্রকাশ করিবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করেন, বাক্যস্থিত বিভিন্ন পদের অর্থসমূহের পরস্পর অর্থের দ্বারা সেই ভাবটিই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কাজেই, উল্লিখিত দ্বিবিধ ব্যাখ্যানদ্বারাই বস্তুতঃ তাৎপর্যশব্দের একই অর্থ পাওয়া যাইতেছে। তদশব্দে ঈশ্বরকে ধরিলে 'ঈশ্বরেচ্ছাই তাৎপর্য' এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় বটে, কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ, ঈশ্বরেচ্ছা বা সংকল্পিত অভিধাবৃত্তিরই নিয়ামক (ঘ)।

ইখং চ শুকবাক্যেহপীশ্বরীয়তাৎপর্যজ্ঞানং কারণম্। (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

(ঘ) “তত্র সংকল্পিতার্থশ্চ বোধনাদগ্রিমাভিধা”।

(সাহিত্যদর্পণ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

তাৎপর্যশব্দের অর্থ-সম্বন্ধে আচার্য্য বিশ্বনাথ সাহিত্য-
 দর্পণের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি
 প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—তাৎপর্য্য শব্দের অর্থ কি?
 বৃত্তিরূপে তাৎপর্য্যের স্বীকৃতি (ঙ) ? তাহার পর তিনি এই প্রশ্নের সমাধান
 করিয়াছেন। আচার্য্য বিশ্বনাথ দেখাইয়াছেন
 যে, পূর্বোক্ত অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা হইতে তাৎপর্য্য
 সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহার মতে চারিটি বৃত্তিই স্বীকার করা
 উচিত (চ)।

তাৎপর্য্য নামে একটি পৃথক্ বৃত্তি স্বীকার করা উচিত
 কি না, এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে
 প্রথমেই অভিহিতাশ্রয়বাদ, অশ্রিতাভিধানবাদ
 অভিহিতাশ্রয়বাদ ও অশ্রিতাভিধানবাদ প্রভৃতির আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে
 হইবে; কারণ, ঐসকল মতবাদ-সংক্রান্ত
 সিদ্ধান্তের উপরই তাৎপর্য্য নামে স্বতন্ত্র বৃত্তির স্বীকৃতি
 অথবা অস্বীকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অভিহিতাশ্রয়বাদ
 এবং অশ্রিতাভিধানবাদ কাহাকে বলে, তাহা পূর্বেই
 আলোচনা করিয়াছি। ইহা ছাড়া দ্বিধা বিভক্ত তৃতীয় আর
 একটি মত দেখা যায়। ঐ মতের সমর্থকগণ প্রথমোক্ত মত-

(ঙ) কিমিদং তৎপর্য্যং নাম, তদর্থং বা, তাৎপর্য্যবৃত্ত্য
 তদ্বোধকং বা?

(চ) তেন তুরীয়া বৃত্তিরূপাশ্রয়বিতি নির্বিসবাদমেতৎ।

দ্বয়ের দুইটিকেই স্বীকার করিয়া নিজেদের মত গঠন করিয়া-
 ছেন। তাঁহাদের মধ্যে একদল বলেন—বাক্যস্থিত পদসমূহ
 তাহাদের বাচ্যার্থ বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অস্বরূপ অর্থও
 বুঝাইয়া থাকে। এই মতের নাম—অভিধীয়মানাশয়বাদ।
 অণ্ডেরা বলেন—বাক্যস্থিত পদগুলি তাহাদের অস্বরূপ
 অর্থ বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্যার্থও
 অভিধীয়মানাশয়বাদ বুঝাইয়া থাকে। এই মতের নাম—অস্বীয়-
 মানাভিধানবাদ। উল্লিখিত দুইটি মতই এক নীতির উপর
 প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাদিগকে একই মতের অংশরূপে গ্রহণ
 করা যায়। উভয় মতেই বাক্যস্থিত পদ-
 অভিধীয়মানাভিধানবাদ সমূহের নিজস্ব অর্থ ও অস্বার্থ উভয়ের
 এককালীন বোধ স্বীকার করা হইরাছে। বস্তুতঃ, এই
 তৃতীয় মতটি যুক্তির দিক দিয়া অত্যন্ত দুর্বল ;
 কারণ, অর্থবোধ মনের ক্রিয়া, এবং মন অতি সূক্ষ্ম
 বলিয়া তাহার পক্ষে একসঙ্গে দুইটি জ্ঞানের গ্রহণ
 অসম্ভব (ছ)।

জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে পদের স্বার্থ ও
 অস্বার্থ এক নহে ; এবং এক নহে বলিয়াই উভয়ের এক-
 কালে বোধও অসম্ভব। জয়ন্ত ভট্ট বলেন—যদি প্রথমে

(ছ) সাক্ষাৎকারে সুখাদীনাং করণং মন উচ্যতে।

অর্থোগপণ্ডাজ্ জ্ঞানানাং তস্তাপুঙ্খমিহেত্ততে ॥

(ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

জয়ন্ত ভট্টের মত
 বাচ্যার্থের বোধ স্বীকার করা যায়, তবে অভি-
 হিতাশ্রয়বাদই স্বীকার করিতে হয় ; আর
 যদি প্রথমে অশ্রয়রূপ অর্থের বোধ স্বীকার করা যায়, তাহা
 হইলে অস্বিতাভিধানবাদ স্বীকারের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।
 এই ভাবে তৃতীয় মতটি খণ্ডন করিয়া আচার্য্য জয়ন্ত ভট্ট
 স্বমতের সমর্থনে নিম্নলিখিত প্রাচীন কারিকাটি প্রদর্শন
 করিয়াছেন। যথা—

“ন হি দ্বৈ অনুভূয়েতে ক্রিয়ে এতে পৃথক্ স্থিতে।

অভিধানক্রিয়া চাত্মা বাচ্যস্থা চাশ্রয়ক্রিয়া ॥”

(শ্রায়মঞ্জরী, প্রমাণ প্রকরণ, পৃ—৩৭০)

অভিহিতাশ্রয়বাদ এবং অস্বিতাভিধানবাদের সমর্থনে
 যথাক্রমে নৈয়ায়িক ও মীমাংসকগণ যুক্তির পর যুক্তির
 অবতারণা করিয়াছেন। এই দুইটি মতের মধ্যে কোন্টি
 স্বীকার্য্য—তাহাই আমরা বর্ত্তমানে আলোচনা করিয়া
 দেখিব।

অভিহিতাশ্রয়বাদের সমর্থকগণ বলেন—পদের উচ্চারণ
 মাত্রই পদার্থের প্রতীতি হয়। এইভাবে বাক্যস্থিত
 প্রত্যেকটি পদের অর্থ পৃথগ্ভাবে প্রতীত হওয়ার পর ঐ
 সকল পদার্থের স্মৃতি পরস্পর অস্বিত হইয়া
 অভিহিতাশ্র-
 বাদীদের যুক্তি
 বাক্যার্থের বোধ জন্মায়। ‘গামানয়’ বলিলে
 প্রথমে গো পদার্থটিরই জ্ঞান হয়, তারপর
 আনয়ন ক্রিয়ার জ্ঞান হইয়া অবশেষে উভয় পদার্থের স্মৃতির

পরস্পর অন্বেষে বাক্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। 'গাং
 শুক্লাং বিতাড়য় দণ্ডেন' বলিলেও এইভাবে এক একটি পদের
 অর্থ পৃথগ্ভাবে বোধ হওয়ার পর সকলের অন্বেষে
 বাক্যার্থের প্রতীতি হয়। 'আপনি কোথা হইতে
 আসিতেছেন?'—জিজ্ঞাসিত হইয়া যখন কেহ একটিমাত্র
 পদে উত্তর দেয় 'পাটলিপুত্রাৎ' (পাটনা হইতে) তখন কি
 পদার্থই বাক্যার্থরূপে গৃহীত হয়? অভিহিতাশ্রয়বাদিগণের
 মতে 'পাটলিপুত্রাৎ' পদটি পদার্থের জ্ঞান জন্মাইয়াই বিরত
 হয়; তারপর 'আগতোহস্মি' (আসিয়াছি) কথাটি অধ্যাহৃত
 হইলে পর সমুদয়ের যোগে বাক্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে।
 ইহারা পদার্থ হইতে বাক্যার্থটিকে সম্পূর্ণ পৃথগ্ভাবে গ্রহণ
 করেন (জ)।

অস্বিতাভিধানবাদের সমর্থকগণ বলেন—ব্যুৎপত্তি-
 ব্যতিরেকে কোন শব্দই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না;
 আর ব্যুৎপত্তি গৃহীত হয়, বুদ্ধ-ব্যবহার
 অনুসারে। বুদ্ধ-ব্যবহার আমাদের গোচর
 হয়, পদ রূপে নহে; কারণ, কেবল পদের
 প্রয়োগই হয় না। প্রাচীনেরা বাক্যের লক্ষণ করিয়াছেন—
 'সংহত্যর্থমভিধতি পদানি বাক্যম্' অথবা 'একার্থঃ পদসমূহো
 বাক্যম্'। এই উভয় লক্ষণেই পদসমূহের বাক্য স্বীকার

(জ) পদানি হি স্বঃ স্বমর্থমভিধার নিবৃত্তব্যাপারাগ্যত্বদানীমথা
 অবগতা বাক্যার্থং সম্পাদয়ন্তি।

করা হইয়াছে ; কিন্তু একটিমাত্র পদের বাক্যস্থ স্বীকার করা হয় না।

যদিও 'পচতি' প্রভৃতি একটিমাত্র পদেরও বাক্যস্থ স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি ঐরূপ একপদবাক্যস্থলেও অস্থিতাভিধানবাদিগণ যে ভাবে মিলিতার্থ স্বীকার করেন, তাহা উপক্রম-গিকাতেই আলোচিত হইয়াছে।

আচার্য্যগণ বলেন—একটিমাত্র পদ যখন বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তখনও তাহার অর্থ-প্রতিপাদন-ব্যাপারে দুইটি কার্য্যই দেখা যায় ; একটি স্বকার্য্য এবং অপরটি সংঘাত-কার্য্য ; অর্থাৎ একটি পদার্থ-প্রতিপাদন এবং অপরটি বাক্যার্থ-

প্রতিপাদন। আচার্য্য জয়ন্ত ভট্ট তাঁহার এক পদের দুই কার্য্য 'শ্রায়মঞ্জরী'তে উদাহরণসহ এই মতটি প্রদর্শন করিয়াছেন (ক)।

এইরূপে অস্থিতাভিধানবাদিগণের মতে সংঘাতকার্য্য-বিহীন কেবল পদের ব্যবহারই সম্ভব নহে বলিয়া কেবল-মাত্র অস্থিতাভিধানবাদই স্বীকার্য্য। 'অঙ্গুল্যাগ্রে করিশতম্' প্রভৃতি বাক্যে 'অঙ্গুল্যাগ্র' প্রভৃতি শব্দ লক্ষ্যার্থে ব্যবহৃত হওয়ায় এই সকল স্থলেও অস্থিতাভিধানই বাক্যার্থ-

(ক) অথ কিং সংঘাতকার্য্যম্ কিঞ্চ স্বকার্য্যং, বাক্যার্থ-প্রতিপত্তিঃ সংঘাতকার্য্যং স্বকার্য্যন্ত পদার্থপ্রতিপত্তিঃ ; যথা পাকঃ সংঘাতকার্য্যং স্বকার্য্যং জলনভরণাদি কাষ্ঠস্থান্যাদীনাম্।

(শ্রায়মঞ্জরী)

প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন (ঞ)।

ইহারা বলেন—যেমন শিবিকাবহনে ২, ৪ অথবা ৮ জন লোক একসঙ্গে কাজ করে, যেমন ৩টি শিলা বা খুটির উপর পাকপাত্র বসাইয়া রান্না করিবার সময় ৩টি শিলা বা খুটিই একসঙ্গে কার্য্য করে, বাক্যস্থিত পদসমূহও তেমনি একসঙ্গেই মিলিতার্থ প্রদর্শন করিয়া থাকে। বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে পদসমূহের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রতিপাদনের কোন প্রয়োজন বা উপযোগিতা নাই।

আচার্য্য জয়ন্তভট্ট দেখাইয়াছেন যে, অন্ত্রনিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র অম্বিতাভিধান সর্বত্র বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ নহে। বাক্যস্থিত বিভিন্ন পদ তাহাদের স্বকার্য্য পদার্থ-মাত্রের প্রতিপাদন করে না—একথা ঠিক নহে। যে কোন পদের উচ্চারণমাত্র সেই পদের অর্থ স্মরণ হইবেই। ‘গাং শুক্লাং বিতাড়য় দণ্ডেন’ প্রভৃতি বাক্যে উচ্চারিত গো শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শৃঙ্গলাঙ্গুলাদिवিশিষ্ট গরু নামক জন্তুটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপে শুক্ল প্রভৃতি শব্দও নিজ নিজ পদের অর্থ প্রতিপাদন করে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ‘সকুদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকুদর্থং গময়তি’ এইরূপ যে একটি আয় আছে, তদনুসারে কোন পদ একবার অর্থ প্রতিপাদন করিলে সে ত পুনরায়

(ঞ) তত্রাঙ্গুল্যাগ্রবাক্যোহপি শাক্ষোহন্ত্যেব সম্বয়ঃ। আধারা-
 ধৈর্যক্রিয়ানির্দেশস্তাত্ প্রতীক্ষমানত্যাং। (ভাস্করী)

অর্থ প্রতিপাদনে সমর্থ হয় না ; তবে প্রকাশিত-স্বার্থ পদ পুনরায় সংঘাতার্থ বা বাক্যার্থ প্রকাশ করিবে কিরূপে ? আচার্য্যগণ বলেন—প্রকাশিতস্বার্থ পদ পুনরায় স্বার্থ বা পদার্থ প্রতিপাদনেই অসমর্থ থাকে, সংঘাতার্থ বা বাক্যার্থ প্রতিপাদনে নহে । 'দেবদত্তঃ গামানয়তি' বলিলে প্রথমতঃ কর্তৃবিভক্ত্যন্ত দেবদত্ত পদের জ্ঞান হয় । তারপর কর্ম-বিভক্ত্যন্ত 'গাম্' এই পদের অর্থ প্রতীত হওয়ার সময় দেবদত্ত পদের জ্ঞান আর থাকে না বটে, কিন্তু তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না । অতঃপর 'আনয়তি' এই ক্রিয়াপদের অর্থ-বোধ হইয়া পূর্বোচ্চারিত পদদ্বয়ের স্মৃতির সহিত সমুদয়ের যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহাই বাক্যার্থ ।

আচার্য্য মন্মট ভট্ট তাহার কাব্য-প্রকাশে অম্বিতাভিধান-বাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে দুইটি অনুপপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) 'গামানয়' 'গাং বধান' এই দুইটি বিভিন্ন বাক্যে

মন্মট ভট্ট প্রদর্শিত দুইটি বিভিন্ন গোশব্দ একই পদার্থকে

অনুপপত্তিবশে বুঝাইতেছে ; কারণ, কোন ব্যক্তিকর্তৃক

উচ্চারিত 'গামানয়' বাক্যটি শুনিয়া যখন

সমীপবর্তী লোক একটি গরুকে লইয়া আসে, তখন সেই

ব্যক্তির বা অন্য কাহারও মুখে 'গাং বধান' বাক্যটি শুনিয়া সে

সেই গরুটিকেই বাঁধিতে যত্নবান্ হয় । যদি 'গাম্' পদের

পৃথক অর্থ না থাকিত, তাহা হইলে দুইটি বাক্যের দুইটি

গোশব্দদ্বারা একই পদার্থকে বুঝান সম্ভবপর হইত না ।

(২) একই সময়ে কলিকাতা ও দিল্লীতে বসিয়া দুইজন লোক 'গামানয়' বাক্যটি উচ্চারণ করিল। তখন তাহাদের ভৃত্য বা পার্শ্ববর্তী অন্য কোন লোক একই সময়ে তাহাদের সম্মুখে এক একটি গরু উপস্থিত করিল। অদ্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিলে 'গামানয়' বাক্যের একটি মাত্র অর্থ হওয়া আবশ্যক; কিন্তু এক্ষেত্রে দুই বাক্যের দুইটি গোশব্দ পৃথক্ পৃথক্ গরুকে বুঝাইল। এখানেও পদার্থের প্রতিপত্তি প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

উল্লিখিত প্রথম অনুপপত্তি খণ্ডনের জন্য আচার্য্যগণ প্রত্যভিজ্ঞার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, দুইটি বাক্যে যে দুইটি গোশব্দ দেখা যাইতেছে, তাহারা বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। একই গোশব্দ দ্বিতীয় বার উচ্চারিত হইয়া প্রত্যভিজ্ঞার সাহায্যে প্রথম গোশব্দের অর্থ স্মরণ করাইয়া দিতেছে; কাজেই উল্লিখিত স্থলে অদ্বিতাভিধানবাদের সাহায্যে বাক্যার্থ-নির্ণয়ে কোন অসুবিধা হইতেছে না।

এই যুক্তি স্বীকার করিলেও দ্বিতীয় অনুপপত্তি খণ্ডন করা কঠিন হইয়া পড়ে; কারণ, সেই স্থলে দুইটি বাক্যের দুইটি গোশব্দ দুইটি বিভিন্ন গরুকে বুঝাইতেছে। আচার্য্য মন্মটভট্ট মুখ্যতঃ উল্লিখিত দুইটি যুক্তির সাহায্যে অদ্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন করিয়া অভিহিতাশ্রয়বাদ সমর্থন করিয়াছেন (ট)।

(ট)। "যতপি বাক্যান্তরপ্রযুজ্যমানাত্তপি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়েন তাত্ত্বৈবতানি পদানি নিশ্চীয়ন্ত ইতি পদার্থান্তরমাত্রেণাবৃত্তিঃ পদার্থঃ

বস্তুতঃ গোশব্দে কোন নির্দিষ্ট গরুকে বুঝায় না ;
 গোত্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ গোজাতির অন্তর্গত যে
 মশট ভট্টের বুল্লি খণ্ডন
 কোন একটি গরুকে বুঝায় । ফলে, বিভিন্ন
 স্থানে স্থিত বিভিন্ন-ব্যক্তিকর্তৃক উচ্চারিত গোশব্দ দ্বারা
 বিভিন্ন গরুকে বুঝাইবার পক্ষে কোন বাধা হয় না ।

আমরা প্রত্যেকেই জানি, কোন শিশুকে বিভিন্ন বস্তুর
 নাম শিখাইবার সময় দোয়াত, কলম, পুস্তক, কাপড় প্রভৃতি

সন্ধেতগোচরঃ, তথাপি সামান্যাবচ্ছাদিতো বিশেষরূপ এবাসৌ প্রতি-
 পত্ততে ব্যতিষক্তানাং তথাভূতত্বাদিত্যদ্বিত্যভিধানবাদিনঃ, তেষামপি
 মতে সামান্যবিশেষঃ পদার্থঃ সন্ধেতবিষয় ইত্যতিবিশেষভূতো বাক্যা-
 ন্তর্গতোহসন্ধেতিত্বাদব্যাচ্য এব” । (কাব্যপ্রকাশ, পঞ্চম উল্লাস) ।

“ইখং মীমাংসকমতং দর্শয়িত্বা তত্রৈবানুপপত্তিষয়মুদ্ভাব্য তত্রৈকানু-
 পপত্তে: শকাপরিহারেহপি অন্যানুপপত্তিরশক্যপরিহারেত্যাহ—
 যত্বপীত্যাদিনা গোচর ইত্যন্তেন । গৃহীতশক্তিপদাদ্ বাক্যাদভিন্নমেব
 তাদৃশবাক্যান্তরমিত্যতঃ প্রথমানুপপত্ত্যুদ্বারঃ । দ্বিতীয়ানু-
 পপত্তিমুদ্ভাবয়তি—পদার্থান্তরমাত্রেনেতি শক্তিগ্রহকালদৃষ্টগবাদিনৈবে-
 ত্যর্থঃ ; নথা চ গবাস্তরান্নয়বোধানুপপত্তিরিতি দর্শিতম্ । সমাধত্তে
 তথাপীতি । ... । ইখং মীমাংসকমতং দর্শয়িত্বা তন্মতেহপি ব্যাপ্তেৰ্য-
 ভিচারং দর্শয়তি—তেষামপীতি” । (ঐ, আদর্শচীকা)

“অত্র শক্তিগ্রহকালীন-বাক্যঘটকগবাদিপদতুল্যাদ্ বাক্যান্তরঘটক-
 গবাদিপদাদর্থোপস্থিত্যানুপপত্তিঃ প্রথমা, গৃহীতশক্তিকগবাদিব্যক্তিভিন্ন-
 গবাত্ম্যপস্থিত্যানুপপত্তির্দ্বিতীয়েতি অনুপপত্তিষয়ং, বোধ্যম্” ।

(ঐ, টিপ্পনী)

এক একটি দ্রব্য হাতে লইয়া কেবলমাত্র উহার নাম উচ্চারণ করিলেই উক্ত শিশু উল্লিখিত বস্তুটিকে জানিতে পারে, এবং আবার ঐ সকল শব্দের উচ্চারণমাত্র শুনিলেই তাহার উক্ত বস্তুসমূহের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে বহুপদযুক্ত বাক্যপ্রয়োগের কোন প্রয়োজনই হয় না। আবার বাক্যমধ্যে দ্বিতীয়াদिवিভক্তিসম্বলিত ঐ সকল শব্দ শুনিলে তখন লোকের মনে বিভক্তির শক্তিসংবলিত ঐ সকল বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেকটি বাক্যে অভিহিতা-স্বয় এবং অস্বিতাভিধান পরস্পর নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। অভিহিতাস্বয় অনুসারে প্রথমে পদার্থের জ্ঞান হয়, তারপর আবার অস্বিতাভিধান অনুসারে পদার্থসমূহের অস্বয়ের পর বাক্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। পদের স্বকার্য্যসাধনে অর্থাৎ পদদ্বারা পদার্থ-প্রতিপাদনে অভিহিতা-স্বয় আর পদ বা বাক্যের সংঘাতার্থ-সাধনে অর্থাৎ বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে অস্বিতাভিধান কার্য্য করিয়া থাকে। এই উভয় কার্য্য এককালে না হওয়ায় উভয়ের সমন্বয়ে বাক্যার্থের প্রতীতি হয় বলিয়া স্বীকার করাও চলে না।

জয়ন্ত ভট্ট বলেন, অস্বিতাভিধান যখন তাৎপর্য্যশক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট হয়, কেবলমাত্র তখনই সে বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। ইহা

জয়ন্ত ভট্টের সিদ্ধান্ত

ছাড়া অভিহিতাশ্রয় প্রভৃতি আর কিছুই এক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয় না (ঠ)।

আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—বাক্যার্থ-প্রতিপাদনের জন্য বাক্যস্থিত যে সকল পদের পরস্পর অশ্রয় হয়, তাহারা অভিহিতস্বার্থ, না অনভিহিতস্বার্থ? উপলব্ধি অনুসারে এবং ‘অনর্থকানাং প্রয়োগঃ’ এই শ্রুতির শিক্ষা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অভিহিতস্বার্থ পদসমূহই অশ্রিত হইয়া থাকে। কাজেই, অভিহিতাশ্রয়বাদকে আমরা উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। এই সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কারিকাদি আছে ; যথা—

“অভিধানক্রিয়ৈবৈকা তদভিভৈজ্ঞঃ পরীক্ষ্যতে ।

অস্বীয়মানতার্থানাং অভিধানাদ্ বিনা কুতঃ ॥”

(ঠ) “এবং পদাশ্রয়ি পরস্পরাপেক্ষাণি সংহত্য কার্য্যং করিষ্যন্তি, ন চ পরস্পরমর্থমভিধানশ্চি। বাক্যাশ্রয়ি প্রকরণপতিতান্ত্রৈবমেব, তদুক্তম্—

প্রকৃতি-প্রত্যয়ৌ বহুদপেক্ষেতে পরস্পরম্ ।

পদং পদান্তরং তদ্বদ্ বাক্যং বাক্যান্তরন্তথা ॥ ইতি ।

অয়মেব চ পক্ষঃ শ্রেয়ান্ যং সংহত্যকারিত্বং পদানাং সঙ্গীর্ণার্থত্বক্ ।—

নিরপেক্ষপ্রয়োগেহয়ঃশলাকাকল্পনা ভবেৎ ।

তদধিতাভিধানে তু পদান্তরমর্থকম্ ॥

সংহত্যকারিপক্ষে তু দোষো নৈকোহপি যুজ্যতে ।

তেনায়ম্পগন্তব্যো মার্গো হি হতকণ্টকঃ” ॥

—তায়মঙ্গরী (চৌপাশ্বা), প্রমাণ প্রকরণ, পৃষ্ঠা—৩৭২

বাক্যস্থিত পদসমূহের পরস্পর অর্থের পর অর্থোপলব্ধি হয় বলিয়া যাহারা মনে করেন, তাহাদের মতটি আমরা নির্বিচারে সমর্থন করিতে পারিতেছি না ; কারণ, আমাদের বিবেচনায় পদার্থসমূহের পরস্পর অর্থের ফলেই বাক্যার্থ-প্রতিপত্তি হয়, পদসমূহের অর্থের ফলে নহে। এই বিষয়েও অভিহিতাশ্রয়বাদীদের মতটিকেই আমরা অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত মনে করি।

নব্যনৈয়ায়িকগণ তাৎপর্যের অস্তিত্ব ও উপযোগিতা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাহাকে বৃত্তি নামে অভিহিত করিতে চাহেন না। তাহারা বলেন—আসত্তি, যোগ্যতা এবং আকাজক্ষা যেমন শব্দবোধে সহায়তা করে, তাৎপর্যও তেমনি সহায়তামাত্র করিয়া থাকে : অভিধা ও লক্ষণার মত তাৎপর্য অর্থনির্ণয়ে স্বতন্ত্র ব্যাপার নহে (ঙ)।

আচার্য্য বিশ্বনাথ তাহার সাহিত্যদর্পণে যোগ্যতা, আকাজক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহকে বাক্য বলিয়াছেন (বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ)। তিনি তাৎপর্যকে পৃথগ্বৃত্তিরূপে স্বীকার করায় বাক্যোৎপত্তি-ব্যাপারে যোগ্যতা

(ঙ) “আসত্তিযোগ্যতাকাঙ্ক্ষা তাৎপর্যজ্ঞানমিষাতে”।

(ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা—৮২)

“আসত্তিজ্ঞানং যোগ্যতাজ্ঞানমাকাঙ্ক্ষাজ্ঞানং তাৎপর্যজ্ঞানঞ্চ শব্দবোধে কারণম্”—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

প্রভৃতির সঙ্গে তাৎপর্য্যকে গণনা করেন নাই। যোগ্যতা = পদার্থসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধাভাব। আকাজ্জনা = প্রতীতি-পর্য্যবসানবিরহ (অর্থের অসম্পূর্ণতা)। আসত্তি = বুদ্ধির অবিচ্ছেদ। 'বহির্না সিদ্ধতি' বলিলে বহির্ভে সেচনযোগ্যতা না থাকায় বাক্য হয় না। গরু, ঘোড়া, হাতী ইত্যাদি কয়েকটি পদের একত্র উচ্চারণ করিলে গরু প্রভৃতিপদে অর্থের অসম্পূর্ণতা না থাকায় সমুদয়ের বাক্য হয় না। আবার সকালবেলা 'দেবদত্ত' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিকালে 'যাইতেছে' বলিলে এই স্থলে বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় আসত্তির অভাব হেতু বাক্য হয় না।

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর রচয়িতা বিশ্বনাথ পঞ্চানন বলেন, আসত্তি প্রভৃতির ত্রায় তাৎপর্য্যও শব্দবোধে একটি কারণমাত্র। তাঁহার মতে তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ না হইলে 'সৈন্ধবমানয়' বলিলে সৈন্ধবশব্দে কখনও অশ্ব কখনও বা লবণকে বুঝাইত না। তিনি বলেন, তাৎপর্য্যগ্রাহক প্রকরণাদিকে এইস্থলে কারণরূপে গ্রহণ করা যায় না; কারণ, তাদৃশ প্রকরণাদির উপলব্ধি হয় না। তাৎপর্য্য বলিতে তিনি বক্তার ইচ্ছাকেই বুঝেন; কাজেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শুকপক্ষী যখন মানুষের মত কথা বলে, তখন ত তাহার কোন ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু শ্রোতাদিগের নিকট শুকপাখীর উচ্চারিত বাক্যের অর্থও ত উপলব্ধি হয়। আবার বেদের কোন রচয়িতা না থাকা সত্ত্বেও

বেদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে কি তবে তাৎপর্য নাই? উত্তরে উক্ত আচার্য্যপ্রবর বলেন— উল্লিখিত স্থলে ৬দৈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই তাৎপর্য জ্ঞান হইয়া থাকে। বিসংবাদিশুকবাক্যে শিক্ষয়িতার ইচ্ছা তাৎপর্যের কার্য্য করে। অত্যাণ্ড আচার্য্যগণ এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, নানার্থশব্দস্থলে এবং শুকবাক্যে তাৎপর্য ছাড়াই অর্থোপলব্ধি হয়। বেদের বেলাও এই নিয়ম; তবে বেদের ক্ষেত্রে অনাদি-মীমাংসা-পরিমোক্ষিত তর্কদ্বারা অর্থাবধারণ হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ, বক্তার ইচ্ছা অথবা অদ্বয়-বোধিকা শক্তি যে অর্থেই আমরা তাৎপর্য্যকে গ্রহণ করি না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে একই রূপে দেখিতে পাই। এই তাৎপর্য্য বৃত্তি নহে—
 এই মতের স্থাপন সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা যেমন শব্দের শক্তি, তাৎপর্য্য সেইরূপ শক্তি নহে। ইহা যথার্থই আসত্তি প্রভৃতির ন্যায় অর্থ-নির্ণয়ের সহায়কমাত্র।

বৃত্তিসমূহের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি বৃত্তি নিজ সামর্থ্য্য অনুসারে অর্থ-প্রকাশের চেষ্টা করিয়া বিরত হইলেই অপর বৃত্তির আবির্ভাব হয়। অভিধা বিরত হইলে লক্ষণা এবং লক্ষণা বিরত হইলেই ব্যঞ্জনাবৃত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে; কিন্তু তাৎপর্য্য এইরূপ কোন নিয়ম মানিয়া চলে না। অত্যাণ্ড বৃত্তি বিরত

হউক বা না হউক বাক্য থাকিলে সাধারণতঃ তাহাতে তাৎপর্য থাকিবেই। এই কারণে আমরা তাৎপর্যকে বৃত্তি নামে অভিহিত না করিয়া অর্থনির্ণয়ের সহায়করূপে গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করি। তবে, তাৎপর্য ছাড়া বাক্য হইতে পারে না—এমন ধারণা আমাদের নাই।

বক্তার ইচ্ছারূপ তাৎপর্য রোগী অথবা নিদ্রিত ব্যক্তির প্রলাপে কিংবা শুকপক্ষী প্রভৃতির উচ্চারিত বাক্যে থাকে না। শুকবাক্যে ঈশ্বরেচ্ছারূপ তাৎপর্য অথবা বিসংবাদিশুকবাক্যে শিক্ষয়িতার ইচ্ছারূপ তাৎপর্য স্বীকার করাও আমাদের বিবেচনায় অযৌক্তিক। অভিধা-ব্যতিরিক্তস্থলেও যদি ঈশ্বরেচ্ছাকে অর্থনির্ণয়ের হেতুরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সর্বত্রই অনুরূপ ঈশ্বরেচ্ছার অর্থ-নির্ণয়হেতু কল্পনা করা সম্ভব হওয়ায় অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনারূপ বৃত্তিত্রয়ের স্বীকৃতি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে, শিক্ষয়িতার তাৎপর্য যদি বিসংবাদিশুকবাক্যে হেতু হইতে পারে, তাহা হইলে সর্বত্রই একজন শিক্ষয়িতার অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব হওয়ায়, অত্যাশ্রয় বৃত্তির সহিত ঈশ্বরেচ্ছারূপ তাৎপর্যের স্বীকৃতিও অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে।

একপদসংবলিত বাক্যে অস্বয়বোধিকাশক্তিরূপ তাৎপর্য স্বীকারের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ‘কিং করোতি ভবান্?’ (আপনি কি করিতেছেন), এই প্রশ্নের উত্তরে যখন কেহ বলে “পঠামি” (পড়িতেছি)

তখন এই 'পঠামি' পদটি শুনিবামাত্রই শ্রোতার অর্থবোধ হইয়া থাকে। 'পঠামি' পদটি শুনিবার পর যদি প্রথমে 'অহং' পদের অধ্যাহার এবং তাহার পর উভয়পদের অদ্বয়জ্ঞান হইয়া অর্থবোধ হইত, তবে এত তাড়াতাড়ি অর্থবোধ জন্মিত না। কাজেই, অমুরূপ স্থলে অদ্বয়রূপ তাৎপর্য স্বীকার করা আমাদের বিবেচনায় অনাবশ্যক। তবে একথা আমরাও বলি যে, সাধারণতঃ বাক্য থাকিলেই তাহাতে তাৎপর্য থাকিবে। যে স্থলে তাৎপর্য ছাড়াও বাক্য দেখা যায়, সেইস্থলে আমরা ঐগুলিকে ব্যতিক্রম (exception) বলিয়াই মনে করি।

আলোচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের নাম.

- | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|
| ১। | অষ্টৈতসিদ্ধি | — মধুসূদন সরস্বতী |
| ২। | অভিধারুত্তিমাছুকা | — মুকুল ভট্ট |
| ৩। | অভিনবগুপ্ত | |
| ৪। | অমরকোষ | — অমর সিংহ |
| ৫। | আদর্শটীকা (কাব্যপ্রকাশের) | — মহেশ্বর ত্রায়ালঙ্কার |
| ৬। | কণাদমুদ্রাণি | |
| ৭। | কাব্যনির্ণয়ঃ | — ধনিক |
| ৮। | কাব্যপ্রকাশঃ | — মন্মটভট্ট |
| ৯। | কাব্যপ্রকাশ টিপ্পনী | — |
| ১০। | কাব্যপ্রদীপঃ | — শ্রীগোবিন্দ |
| ১১। | কাব্যপ্রভাকরঃ | — এই গ্রন্থকারের রচিত |
| ১২। | কাব্যালঙ্কারঃ | — ভামহ |
| ১৩। | কাব্যালোক | — সুধীরকুমার দাশগুপ্ত |
| ১৪। | কৈয়টঃ | |
| ১৫। | গৌতমমুদ্রাণি | |
| ১৬। | চন্দ্রালোকঃ | — জয়দেব |
| ১৭। | ছায়া (সাহিত্যদর্পণ-বিস্তৃতিঃ) | — মঃ মঃ দুর্গাপ্রসাদ |
| ১৮। | জৈমিনিমুদ্রাণি | |
| ১৯। | তর্কভাষা | — কেশবমিশ্র |
| ২০। | তর্কামৃতম্ | — জগদীশ ভট্টাচার্য |

(৯০)

২১।	তত্ত্বসংগ্রহঃ	—	শান্তরক্ষিত
২২।	তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা	—	কমলশীল
২৩।	তত্ত্ববাস্তিক	—	কুমারিল ভট্ট
২৪।	ধ্বত্নালোকঃ	—	আনন্দবর্দ্ধন
২৫।	ধ্বত্নালোক-লোচনম্	—	অভিনবগুপ্ত
২৬।	নিরুক্তম্	—	বাস্ক
২৭।	নিরুক্তব্যাক্য	—	ভূর্গাচার্য
২৮।	ত্ৰায়কুসুমাজলিঃ	—	উদয়নাচার্য
২৯।	ত্ৰায়দর্শনঃ	—	মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
৩০।	ত্ৰায়মঞ্জরী	—	জয়ন্তভট্ট
৩১।	পরমলঘুমঞ্জুষা	—	নাগেশভট্ট
৩২।	পরিমলঃ	—	অশ্বয় দীক্ষিত
৩৩।	পাণিনিমুদ্রাণি		
৩৪।	পাতঞ্জলমহাভাষ্যম্		
৩৫।	প্রকরণ-পঞ্জিকা	—	শালিকনাথ মিশ্র
৩৬।	প্রকাশটীকা (কুসুমাজলির)	—	বর্দ্ধমান উপাধ্যায়
৩৭।	প্রশস্তপাদভাষ্যম্		
৩৮।	বাক্যপদীয়ম্	—	ভট্টহরি
৩৯।	বাংলায়নভাষ্যম্		
৪০।	বালবোধিনী (ব্যাকরণের টীকা)		
৪১।	বেদান্ত-কল্পলতিকা	—	মধুসূদন সরস্বতী
৪২।	বেদান্ত পরিভাষা	—	ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র
৪৩।	বৈয়াকরণভূষণসারঃ	—	কোণ্ডভট্ট
৪৪।	সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা	—	নাগেশভট্ট

(১০)

৪৫।	বৃত্তিবার্তিকম্	— অন্নয়দীক্ষিত
৪৬।	বৃহতী	— প্রভাকর ভট্ট
৪৭।	ব্যক্তিবিবেকঃ	— মহিম ভট্ট
৪৮।	ব্রহ্মসূত্রানি	
৪৯।	ভট্টলোল্লটঃ	
৫০।	ভাষাপরিচ্ছেদঃ	— বিশ্বনাথ
৫১।	মহাভারতম্	
৫২।	মানবপ্রজাপতীম্	— এই গ্রন্থকারের রচিত
৫৩।	মীমাংসাদর্শন	— সুখময় ভট্টাচার্য্য
৫৪।	মীমাংসালোকবার্তিকম্	— কুমারিল ভট্ট
৫৫।	যোগদর্শনম্	— পতঞ্জলি
৫৬।	রঘুবংশম্	— কালিদাস
৫৭।	রসগঙ্গাধরঃ	— জগন্নাথ পণ্ডিত
৫৮।	রাকাগমটীকা	— গাগাভট্ট
৫৯।	রুদ্রপ্রমথরম্	— এই গ্রন্থকারের রচিত
৬০।	লঘুগঙ্গা	— নাগেশ ভট্ট
৬১।	শক্তিবাদঃ	— গদাধর ভট্টাচার্য্য
৬২।	” টীকা	— মাধবতর্কসিদ্ধান্ত
৬৩।	” ”	— হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত
৬৪।	শব্দকল্পদ্রুম	
৬৫।	শব্দশক্তি-প্রকাশিকা	— জগদীশ তর্কালঙ্কার
৬৬।	” টিপ্পনী	— মঃ মঃ গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ
৬৭।	শাবরভাষ্যম্	
৬৮।	শ্রীপতিদত্ত	

(১০)

- ৬৯। শ্রীভাষ্যম্ — রামানুজাচার্য
- ৭০। শ্রুতিঃ
- ৭১। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
- ৭২। „ টীকা
- ৭৩। সাংখ্যদর্শনম্
- ৭৪। সাহিত্যদর্পণঃ — বিশ্বনাথ
- ৭৫। „ বিবৃতিঃ — মঃ মঃ রামচরণ তর্কবাগীশ
- ৭৬। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী — বিশ্বনাথ
- ৭৭। A short Analysis of the contents of the
kavyaprakasa by—Dr Amareswar Thakur
M-A, Ph-D.
- ৭৮। Indian Æsthetics by Dr. Kantichandra Pande
M-A. Ph-D. D-Litt.
- ৭৯। Practical Criticism — I. A. Richards.
- ৮০। Significs and Language — Lady Webbly.
- ইহা ছাড়া অত্র গ্রন্থও আলোচিত হইয়াছে।